ঐতিহ্যের অধিকার

কালের স্বরূপ ও সঙ্গীতের নির্মাণ



পুলক দত্ত

ঐতিহ্যের অধিকার

কালের স্বরূপ ও সঙ্গীতের নির্মাণ

ঐতিহ্যের অধিকার

কালের স্বরূপ ও সঙ্গীতের নির্মাণ



পুলক দত্ত

লেখক কর্তৃক প্রকাশিত ও সজ্জিত

প্রথম প্রকাশ : ৫ অগাস্ট ২০১৮

প্রথম প্রচ্ছদ : মদনমোহন মন্দির, বিষ্ণুপুর ১৯৮৪
নামপত্র : পুলক দত্ত, *মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে* (অংশ)।
জলরং ও প্যাস্টেল, ২০১০
চতুর্থ প্রচ্ছদ : পুলক দত্ত, *‘আমাদের আধুনিকতা’-র সন্ধানে*। ফোটোগ্রাফ, ২০১৭

১০০ টাকা

নিবেদন

বছর দুয়েক আগে আন্তরিক এক পরিবেশে বাংলা কীর্তন শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। বন্ধুর অনুরোধে সেই কীর্তন শোনার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলাম ; ময়নাডাল থেকে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদিত *মালঞ্চ* [১৪২৩] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সে-লেখা। এই বইটির প্রথম প্রবন্ধের শেষ অংশটি সেই প্রবন্ধের পরিমার্জিত রূপ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, রিভারসাইড্-এর আমন্ত্রণে ২০০৯, ২০১১ ও ২০১৪ সালে সেখানকার 'টেস্টামেন্ট্ অফ টাইম' কোর্সে অংশ নিতে যাই ; অনার্স ক্লাসের সেই সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা প্রাণবন্ত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে 'ভারতীয় সঙ্গীত ও শিল্পে কালের প্রকাশ' নিয়ে আলোচনায় কাটে অনেকটা সময়। সঙ্গীতের, এমনকী সংস্কৃতির নির্মাণে কালের ও কাল বিভাজনের ভূমিকা সংক্রান্ত চিন্তা গভীরতা পায় এই অভিজ্ঞতায়।

বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তিরিশ বছরেরও বেশি দিন ধরে শিল্পশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকায় 'আধুনিকতা' সংক্রান্ত চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি শিক্ষক-মন।

সঙ্গীতের নির্মাণে কালের ধারণা, কাল বিভাজনের কৌশল ও আধুনিক অথবা অনাধুনিক আদর্শের প্রভাব এবং ভূমিকা ঘিরে গড়ে উঠল এই বই।

এই কাজটি করতে যাঁদের সঙ্গে তর্ক ও আলোচনায় উপকৃত হয়েছি, আমার সেই মাস্টারমশাই, সহকর্মী ও বন্ধুদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই,

শ্রীসুপ্রিয় ঠাকুর, শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী রতি বসু, শ্রীমিলন মিত্রঠাকুর, শ্রীনাইজেল হিউজ, শ্রীতড়িৎ রায়চৌধুরী, শ্রীদেবমাল্য দাস এবং শ্রীঅরণ্য সেনগুপ্ত, শ্রীআকাশ পাল, শ্রীআমন বসু, শ্রীমাসুদ রাইহান ও শ্রীসাগ্নিক সামন্ত।

শান্তিনিকেতন
২০১৮

পুলক দত্ত

সূচী

শ্রুতিমাধুরী

যোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বাংলা, সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ বাংলার সুলতান[১]। এমনই এক সময়ে একদিন, হাত খুলে খোল-কর্তাল বাজানোর আর গলা খুলে নামকীর্তন গাওয়ার আওয়াজ এসে পড়ল সন্ধ্যাবেলা ভ্রমণরত নবদ্বীপের কাজীর কানে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে, বৈষ্ণবদের এই বিচিত্র আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে কাজী এবং তাঁর দলবল ভেঙে দিলেন কীর্তনীয়াদের মাটির খোল, হাতের কাছে যাকে পেলেন মারধর চলল তাদের ওপর, কীর্তনীয়াদের বাড়িও এই অত্যাচার-অনাচার থেকে রেহাই পেল না। যাবার সময় শাসন করে বলে গেলেন যে আজকের মত তিনি এদের ক্ষমা করে দিলেন, কিন্তু আর কখনো শুনতে পেলে শাস্তি পেতে হবে। সঙ্গে এ-কথাও যোগ করলেন যে 'তোদের নিমাঞি আচার্য্যি' কী করতে পারেন, তিনি তাও দেখে নেবেন। এর পর থেকে সন্ধ্যা হলেই দলবল নিয়ে কাজী নবদ্বীপ নগরে বেরিয়ে পড়েন কীর্তনীয়া ধরার আশায়।

একদিকে নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ্য সমাজের ক্রমবর্ধমান চৈতন্য-আন্দোলন বিরোধিতা, কাজীর কাছে সঙ্কীর্তনের 'উৎপাত' নিয়ে তাদের নালিশ আর অন্যদিকে কাজীর শাসানিতে নবদ্বীপের নগরিয়ারা সদ্য প্রচলিত এই নামকীর্তনের চর্চা চালু রাখতে ভয় পেতে লাগলেন। তাঁরা নবদ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার কথাও ভাবতে শুরু করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও তাঁদের এই ভাবনার কথা জানাতে তাঁরা চৈতন্যদেবের ('তোদের নিমাঞি

---

[১] রাজত্বকাল : ১৪৯৩-১৫১৯

আচার্য্য') কাছে উপস্থিত হলেন। চৈতন্যদেব ঘটনার বিবরণ শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং সম্মিলিত ভাবে কাজীর মুখোমুখি হয়ে এর মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর পর চৈতন্যদেবের আহ্বানে আর নিত্যানন্দের উদ্যোগে সেই দিনই বিকেলে ধীরে ধীরে একত্র হতে লাগলেন নবদ্বীপের ছোটো-বড়ো, নারী-পুরুষ, দরিদ্র-ধনী নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ। স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলায় চৈতন্যদেবের পরিচালনায় সাজানো হল সুসম্বদ্ধ এক শোভাযাত্রা : শোভাযাত্রার শুরুতে অদ্বৈত আচার্য ও তাঁর সঙ্গে এক দল গায়ক, মাঝখানে আরেক দল গায়কসহ হরিদাস আর তার পিছনে শ্রীবাস, সঙ্গে গায়কগণ। একদম পিছনে একত্রে নৃত্যরত চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ, তাঁদের ঘিরে গেয়ে চলা এক দল অনুচর।

সন্ধ্যা নেমে এল চারিদিক অন্ধকার করে। গঙ্গার ঘাটে বেশ কিছুক্ষণ গান-বাজনা করে নগরকীর্তনের দল এগিয়ে চলল গঙ্গার পাড় ধরে এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে : মাধাইয়ের ঘাট-বারকোনা ঘাট-নগরিয়া ঘাট। সমবেত সকলের হাতে প্রজ্বলিত মাটির প্রদীপ, অনেক দূর অবধি দেখা যায় প্রদীপের আলোর সেই ছন্দোময় গতি : অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের কী আশ্চর্য দীপ্তি, কী দৃপ্ত এই যাত্রা। ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে সমবেত বৈষ্ণবেরা করে চলেছেন নামকীর্তন, মৃদঙ্গ বাদকেরা চলেছেন কাঁধে খোল নিয়ে নেচে-নেচে, বাজাতে-বাজাতে। সঙ্গে বেজে চলেছে মন্দিরা, কর্তাল আর শাঁখ। যাত্রাপথের পাশের বাড়িঘর মাঙ্গলিক দ্রব্যে সাজানো, চলার পথে লোকে ছড়িয়ে চলেছে খই, কড়ি, পয়সা। ভাবোন্মত্ত অবস্থায় কেউ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন, কেউ বা লুটিয়ে পড়ছেন অন্যের গায়ে। কেউ চড়ে বসছেন সহযাত্রীর কাঁধে, কেউ আবার গাছে চড়ে সেখান থেকে দিচ্ছেন লাফ। আনন্দ-উচ্ছ্বাসে, নাচ-গানে, প্রেম-ভক্তিতে ডুবে যাওয়া এই শোভাযাত্রা যত এগিয়েছে কাজীর বাড়ির দিকে ততই বেড়েছে তার উত্তেজনা-উন্মাদনা। এই ভাবে ঘাটের পর ঘাট পেরিয়ে 'নিমাঞি আচার্য্য' নবদ্বীপের এক প্রান্তে সিমুলিয়া নগরে কাজীর বাড়ি পৌঁছলেন। হট্টগোল শুনে প্রথমে কাজী ভেবেছিলেন কোনও বিয়েবাড়ির শোভাযাত্রা চলেছে, তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে কেউ নগরকীর্তন করতে

সাহস পাবেন, এ-কথা তিনি ভাবতেও পারেন নি। বাইরে বেরিয়ে চৈতন্যদেব ও তাঁর সঙ্গে কীর্তনীয়াদের এই বিশাল দল দেখে কাজী তাঁর দলবল নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। অবশেষে উত্তেজিত এই নগরিয়ারা কাজীর বাড়ি-বাগান ইত্যাদি ভেঙে তছনছ করে শাঁখারী পাড়া-তাঁতিপাড়া হয়ে ফিরে আসেন।[২]

পাঁচশো বছরের দূরত্বে বসে দেখা সম্ভাবনাময় এই আন্দোলন আজও মনকে আনন্দ-উত্তেজনায় দুলিয়ে তোলে। কী অপূর্ব সেই দৃশ্য, কী সুদূরপ্রসারী এর তাৎপর্য! কী মধুর এর চলন আর কী গভীর বাঙালি সঙ্ঘশক্তির এই উদ্বোধন!

আহ্বান আর প্রেম

যে সময়ে বাংলা বহু বিরোধী দর্শন, সম্প্রদায়, জীবনচর্যা ও আচরণে বিভক্ত, সেই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের বাণী নিয়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। বাঙালির সঙ্ঘশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে চৈতন্যদেব গণমুখী যে ধার্মিক-সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তাতে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল নামকীর্তন। ৮৯২ বঙ্গাব্দের ২৩ ফাল্গুন, [১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি, মতান্তরে ১৭ মার্চ] দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র ও শচী দেবীর সংসারে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। সংসারাশ্রমে তাঁর নাম ছিল বিশ্বম্ভর মিশ্র, ডাকনাম নিমাই / নিমাঞি। জ্বলন্ত সোনার মত গায়ের রং হওয়ায় নবদ্বীপে তিনি গৌরাঙ্গ নামেও পরিচিত ছিলেন, আর সন্ন্যাস আশ্রমে তাঁর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

সেই যুগের জ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র নবদ্বীপের টোলেই নিমাই লেখাপড়া করেন। বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে জানা যায় যে তিনি কাব্য, নাটক,

---

[২] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, *চৈতন্যভাগবত* ২/২৩ ও *চৈতন্যচরিতামৃত* ১/১৭। আনুষঙ্গিক তথ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, 'নবদ্বীপে নগরকীর্তন', *বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস*, সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোস্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা। ১৯৮৯, পৃ. ৫২-৬২।

স্মৃতি, ন্যায় ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন এবং আঠারো কি উনিশ বছর বয়সে নিজে টোল খুলে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এর আগেই নিমাইয়ের বাবা জগন্নাথ মিশ্র মারা যান, তখন তাঁর বয়স এগারো কি বারো ; সাত-আট বছরের বড়ো দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যান। লেখাপড়া শেষ করার আগেই, পনেরো-ষোল বছর বয়সে, নিজে পছন্দ করে বল্লভ আচার্যের মেয়ে লক্ষ্মীকে বিয়ে করেন। চার পাঁচ বছর পর অপঘাতে লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়, নিমাই তখন পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে। আবার বিয়েতে রুচি না থাকলেও, এর কিছুদিনের মধ্যে মায়ের অনুরোধে সনাতন মিশ্রর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইয়ের বিয়ে হয়।

ছোটোবেলায় বড়োদাদার গৃহত্যাগ ও প্রথম যৌবনে স্ত্রীর মৃত্যু নিমাইয়ের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। ১৫০৮ সালে বাইশ বছর বয়সে, পিতৃকৃত্য করতে তিনি যখন গয়া যান তখন প্রেমধর্মের প্রবর্তক মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সন্ন্যাসী ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হয়। নবদ্বীপে যাতায়াতের সূত্রে ঈশ্বর পুরী নিমাইকে চিনতেন, যদিও তাঁদের মধ্যে কখনো কোনও রকম আধ্যাত্মিক চিন্তা বা বোধের আদানপ্রদান হয় নি। সেই আধ্যাত্মিক যোগ ঘটল এই বারের গয়া ভ্রমণে : বিশ্বম্ভর ঈশ্বর পুরীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করলেন, তাঁর মনে কৃষ্ণাবেশ সঞ্চারিত হল।

নবদ্বীপ ফিরে নিমাই পণ্ডিতের মন জ্ঞান ও তত্ত্বের প্রচলিত চর্চা অতিক্রম করে ক্রমাগত ঢুকে পড়তে লাগল প্রেম ও ভক্তির জগতে। ছাত্রদের পড়ানোর সময় সব তত্ত্বের মধ্যেই তিনি কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন এবং ছাত্রদের দিশা দেখানোর জন্য 'হাতে তালি দিয়া' তাদের কীর্তন শেখাতে শুরু করলেন[৩]। মনে করা হয় এই হল সঙ্কীর্তনের জন্মলগ্ন। অনেকে মিলে একসঙ্গে গাওয়া যে-নামগান (এবং সঙ্কীর্তন, নগর কীর্তন) পরবর্তী কালে গভীর ভাবে প্রভাবিত করবে সমগ্র বাঙালি জাতির জনজীবনকে। পরবর্তী কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে এই নামকীর্তন আর নগর কীর্তনের প্রচার আর নির্মাণ। নিমাই পরিকরেরা তাঁর নির্দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত

[৩] 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। / গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥', এই শ্লোকটি চৈতন্য-প্রবর্তিত কীর্তন গানের আদি বাণী।

হয়ে সমগ্র নবদ্বীপ জুড়ে সর্বত্রগামী করে তুললেন নামকীর্তনকে। নবদ্বীপে প্রেমভক্তি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেল, প্রেমের ঢেউ মিলিয়ে দিল ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালকে ; গড়ে তুলল বাঙালির গণশিল্প, গণসঙ্গীত আর গণ আন্দোলনের ঐতিহ্য।

বছর দেড়েক নবদ্বীপে কীর্তনের প্রচার করে ১৫১০ সালের ২৬ জানুয়ারি ২৪ বছর বয়সে নিমাই পণ্ডিত কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নতুন চেহারা, বেশ এবং নামে নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত এর পর তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। সমাজে পরিচিত হন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, চৈতন্যদেব অথবা মহাপ্রভু নামে। সন্ন্যাস গহণের পরের দিন থেকে সাত আট দিন ধরে রাঢ় অঞ্চল ভ্রমণ সেরে ফিরে আসেন শান্তিপুরে। এখান থেকেই রওনা হন নীলাচল বা পুরীর উদ্দেশ্যে, নীলাচলে কিছুদিন কাটানোর পর বেরিয়ে পড়েন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে। দুই দফায় আড়াই বছরের বেশিদিন ধরে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ সেরে চৈতন্যদেব নীলাচলে ফিরে আসেন ১৫১২ সালের শেষের দিকে। ১৫১৪ সালে বৃন্দাবন ভ্রমণ করে বাংলা হয়ে নীলাচল ফিরে আসেন ১৫১৫ সালের মার্চ মাসে। এই দুই দীর্ঘ ভ্রমণ কালে ভারতবর্ষের বহু বিশিষ্ট সাধক, রসিক, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ও শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ ও আলোচনার সুযোগ হয়। এর পর টানা আঠারো বছর নীলাচলে কাটানোর পর আটচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। চৈতন্যজীবনকে নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমে সাজানো যায়[৪] : জীবনের প্রথম বাইশ বছর তাঁর কাটে উদ্ধত চপল তর্কপ্রিয় নিমাই আর নিমাই পণ্ডিত হিসেবে, পরের দুই বছর কৃষ্ণপ্রেমে নামকীর্তন করে। সংসারাশ্রম ত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রমের প্রথম ছয় বছর কাটে ভ্রমণে, সন্ন্যাসী-শিরোমণি আচার্যের লীলায়, সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রদ্ধাভক্তি প্রচারে। নীলাচলে জীবনের শেষ আঠারো বছরের প্রথম ছয় বছর ভক্তসঙ্গে বাস ও আচার্য-লীলাভিনয় ও পরবর্তী বারো বছর কাটে অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে রসাস্বাদন-লীলায়।

ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্মের কোনও সম্প্রদায়ই শঙ্করের মায়াবাদ স্বীকার

---

[৪] শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, *শ্রীচৈতন্যদেব*, গৌড়ীয়-মিশন, কলিকাতা। ১৯৪৬, পৃ. ৩৮৫

করে না। সব বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই জড় ও জীবজগতের অন্তত আংশিক সত্তা স্বীকৃত যদিও ব্রহ্ম বা কৃষ্ণের সঙ্গে জড় ও জীবের সম্পর্কের প্রকার নিয়ে বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ আছে। চৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা এই ধারায় যে দার্শনিক সিদ্ধান্তটি প্রচার করে গেছেন তা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। জীব গোস্বামী তাঁর 'ষট্সন্দর্ভ'-এর 'সর্বসম্বাদিনী' অনুব্যাখ্যায় এই দার্শনিক প্রস্থান বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই মত অনুসারে জীব ও জগৎ মিথ্যা নয়, ব্রহ্মের সঙ্গে জড় ও জীবের যেমন ভেদ আছে তেমনই আছে অভেদ। সসীম মানুষের চিন্তায় একই সঙ্গে ভেদ এবং অভেদের ধারণা অচিন্ত্যনীয়, তাই এই নামকরণ - অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ।[৫] দার্শনিক অথবা শাস্ত্রীয় মণ্ডলীতে এই তত্ত্বের মূল্য যাই থাক না কেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এই বিশ্বাস সাংস্কৃতিক বিকাশের দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃতি ও সমাজেই গৌড়ীয় সংস্কৃতি খুঁজে পায় তার ভিত্তিভূমি ; তার প্রকাশ আর বিকাশ বাংলার পোড়ামাটির মন্দিরে, কীর্তন গানে, পুঁথির পাটায়, সহজ জীবনচর্যায়, জাত-পাত প্রথা ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে অস্বীকার করায় এবং ঈশ্বরকে গুরু হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, সন্তান হিসেবে, প্রেমিক হিসেবে পাওয়ার বাসনায়।

আহ্বান আর প্রেমের মন্ত্রেই সমস্ত স্তর ভেদ করে, সকল বিভেদ-বিদ্বেষ পার করে সকলকে এক সমবেত আন্দোলনে জড়ো করেছিলেন চৈতন্যদেব। এই ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান চালিকা শক্তি : বাঙালি জীবনে, মননে, সমাজে এমন কোনও স্তর বা কোণ ছিল না যেখানে এই প্রেমের ঢেউ গিয়ে পৌঁছায় নি। শুধু বাংলাই নয়, এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনদর্শন বিকশিত হয়েছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য আরো অনেক অঞ্চলেই। সামগ্রিক এই জীবনদর্শনের একটি অংশ হল কীর্তন গান। এই জীবনদর্শন ও জীবনচর্যাই নির্মাণ করেছিল কীর্তনের বিশিষ্ট এই রূপ, বাঙালির সাঙ্গীতিক স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছিল কীর্তনের প্রাণবন্ত রূপের মধ্যে।

---

[৫] সত্যেন্দ্রনাথ রায়, 'তত্ত্বের পথে না রসের পথে? গৌড়ীয় আন্দোলনে শ্রীচৈতন্য', *কার মিলন চাও বিরহী : মানুষের ধর্মসঙ্কট*, বাউলমন, কলকাতা। ২০০০

বাংলা কীর্তন শোনার এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা

গত ১৫ মার্চ ২০১৬ শান্তিনিকেতনে নন্দন বাড়ির দোতলায়, জানালাহীন ঠাণ্ডা ঘরে ছোট্ট একটা আসরে, দ্য ট্রাভেলিং আর্কাইভ আয়োজিত 'টাইম আপন টাইম' প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে অল্প কিছু শ্রোতার উপস্থিতিতে, ময়নাডালের মিত্রঠাকুর পরিবারের সচ্চিদানন্দ ও নির্মলেন্দু মিত্রঠাকুর তাঁদের ঘরের আঙ্গিকে লীলাকীর্তন শোনালেন। সঙ্গে দোহার ছিলেন সঞ্জীব ও অঞ্জন মিত্রঠাকুর। বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার অন্তর্গত একটি ছোটো গ্রাম ময়নাডাল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ঘন বনে ঢেকে থাকা এই গ্রামে নৃসিংহবল্লভ মিত্রঠাকুর মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তী কালে এখানে একটি মন্দিরও নির্মিত হয়। একদিকে এই বিগ্রহ এবং মন্দিরকে ঘিরে এখানে যেমন একটি বৈষ্ণব ভক্তদের কেন্দ্র গড়ে ওঠে, অন্যদিকে মিত্রঠাকুর পরিবারে, ময়নাডালের মনোহরশাহী নামে পরিচিত, কীর্তনের চর্চা হয়ে ওঠে জীবনের প্রধান অঙ্গ। গত চারশো সাড়ে চারশো বছর ধরে এখানে যেমন বহু বিশিষ্ট কীর্তনীয়া গান পরিবেশন করেছেন, উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন, তেমনই এখানকার কীর্তনীয়ারা তাঁদের কীর্তনের বিশিষ্ট রূপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পরিবেশন করে চলেছেন। কীর্তন গান ও খোল শিক্ষা করার জন্য এই পরিবার এখানে একটি টোল প্রতিষ্ঠা করে। মণিপুর, শ্রীহট্ট, বরিশাল ইত্যাদি জায়গা থেকে এখানে এসে বসবাস করে শিক্ষা গ্রহণ করতেন শিক্ষার্থীরা, অন্যদিকে জমিদার-রাজাদের কাছ থেকে আসত সচ্ছল ভাবে টোল চালানোর জন্য অনুদান। এই একটি পরিবারেই আজও কীর্তনের চর্চা টিকে আছে। আজও প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে সন্ধ্যারতি হয়, গত প্রায় চারশো বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হয়ে চলেছে এই গান ; কোনও সংবিধানচালিত নিয়মের বাধ্যবাধকতায় নয়, প্রেম আর ভক্তির প্রেরণাই এ-গানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের উৎস। আজও প্রতিদিন এই ঠাকুরবাড়িতে অন্তত ৫০-৬০ জন অতিথি ঠাকুরের ভোগ সেবা করেন।[৬]

[৬] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য নন্দলাল মিত্রঠাকুর, *বৈষ্ণবতীর্থ কীর্তনপীঠ ময়নাডাল* ও

একটি আখ্যানকে সময়ের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত করার অপূর্ব এই সাঙ্গীতিক শৈলী সেদিন আসরের পরেও দীর্ঘক্ষণ শ্রোতাদের মনকে এক বিস্ময়বোধে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই শৈলী দীর্ঘদিনের সমবেত প্রচেষ্টার ফসল : মঙ্গলগান, পাঁচালি, রামায়ণগান ইত্যাদি গানের কাঠামোর মধ্যেও এই শৈলীর যাদুকরি প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য এই যে আসরে কোনও সুরের যন্ত্র ছিল না। নিজের গলার বিস্তৃতি অনুযায়ী গায়ক একেবারে ঠিক সুরে গান শুরু করলেন কোনও রকম সুরের যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই। বিলম্বিত তালের গান আর সঙ্গে লয়ের রাজ্যে খোলের অনায়াস ভ্রমণ! যেমনি তার চলনের দৃঢ়তা তেমনি স্পষ্ট তার বাণী, ধ্বনির গভীরতা। তারই সঙ্গে স্বরে স্থিত অবিচলিত কণ্ঠধ্বনি ; কখনো গমক, মীড় কখনো লীলায়িত তার গতি। শরীরের কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্রিয়ার পরিকল্পিত সমন্বয় এই ধ্বনির উৎস : যেমনি তার উচ্চারণের শুদ্ধতা, তেমনি তার ধ্বনির ব্যাপ্তি। এই দুই ধরণের ধ্বনি, আখ্যানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিন্যস্ত হতে থাকল কালের পটে। তাল থেকে তালান্তরে, সুর থেকে সুরান্তরে, রস থেকে রসান্তরে এগিয়ে চলা, গল্পের চরিত্র অনুসরণ করে লয়ের পরিবর্তন, একই তালের বিভিন্ন অংশে ছন্দ বদল, ছন্দ বৈচিত্র্য-পরিবর্তন-মিলন, আবৃত্তি-অভিনয়-কথোপকথন এইগুলিই পদাবলী ও লীলাকীর্তনের প্রধান উপকরণ। শ্রোতার দল উপভোগ করতে লাগলেন ধীরে ধীরে উন্মীলিত হতে থাকা সেই লীলা। লীলাই বটে! এই দুই গায়ক-বাদক যেন খেলাই করছেন আর অহৈতুক এই লীলার জগতে শ্রোতাদেরও করে নিচ্ছেন তাঁদের সঙ্গী।

ছোটো করে গৌরচন্দ্রিকা সেরে গায়ক শুরু করলেন ১৪ মাত্রার বড় তেওট তালের গান গোষ্ঠলীলা। কৃষ্ণ মা যশোদার কোলে বসে বলছেন, 'মাগো এখন সাজাও আমায় সখা সঙ্গে গোষ্ঠে যাব'। দুই মাত্রায় 'মাগো এখন' গেয়ে ৪। ৪। ৪ ভাগে ১২ মাত্রার ওপর বিন্যস্ত হল 'সাজা -ও আ- মায়। স- খা- স- ঙ্গে-। গো- -ষ্ঠে -যা ব-'। তেওট তালটির মাত্রা

মিত্রঠাকুর পরিবার, ময়নাডাল ঠাকুরবাড়ি, ময়নাডাল, ১৪২৩ [২০১৬]। এ-ছাড়া এই পরিবারের সন্তান শিল্পীবন্ধু মিলন মিত্রঠাকুরের সখ্য ও সঙ্গ বৈষ্ণব সমাজ, বাংলা কীর্তন ও ময়নাডাল ঠাকুরবাড়ি সম্বন্ধে আমার ধারণা গড়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করেছে।

বিভাগ ২। ২। ২। ২। ২। ২। ২ : প্রথম সপ্তম ও একাদশ মাত্রায় তালি (x, ২, ৩), তৃতীয় পঞ্চম নবম ও ত্রয়োদশ মাত্রায় ফাঁক (০)। এই গানটি শুরু হয় পঞ্চম মাত্রার ফাঁক থেকে।

× ০ ০ ২ ০ ৩ ০

১ ২ । ৩ ৪ । ৫ ৬ । ৭ ৮ । ৯ ১০ । ১১ ১২ । ১৩ ১৪

। মাগো এখন । সাজা -ও । আ- মায় । স- খা- । স- ঙ্গে-

গো- -ষ্ঠে । -যা ব- ।

গানের সুরের কাঠামোটি এমনই যে গানটি গাইলে ২। ৪। ৪। ৪-এর ঝোঁকই জোরালো হয়ে ওঠে। ঘুরে ফিরে ওই দুই মাত্রার মুখটা আসে আর তার পরে বাকি বারো মাত্রায় খোলের ছন্দ বদল হয়ে কখনো হয় ৪। ৪। ৪-এর ওপর ৬। ৬। ৬, কখনো ৮। ৮। ৮ ; লয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ১৪ মাত্রা রূপ পেতে থাকে ৭ মাত্রার জমাট ১। ২। ২। ২ আবর্তনের। একই পদ আবর্তিত হতে থাকে ক্রমশ বেড়ে চলা লয়ের সঙ্গে আর শ্রোতারা সেই উন্মাদনায় ঢুকে পড়েন গানের শরীরে। অভিনয়, কথোপকথন, আবৃত্তি সবই হয়ে ওঠে এই গানের অঙ্গ। মা-বেটা যখন কথা চলছে, সে গান নিল ৩-এর ছন্দে ৬ অথবা ১২ মাত্রার আবর্তনের লোফা তালের রূপ। দোহন পর্ব সারা হলে কৃষ্ণর দাদা বলরামকে গানের মূল বিষয় করলেন গায়ক। শ্রোতাদের মন ধরে রাখতে সরলরৈখিক গল্প বলার পারম্পর্য থেকে সরে এসে গল্প অন্য এক রাস্তায় এগোতে শুরু করল। তাঁর যে মধু পান করার অভ্যাস ছিল, বলরামের সেই মত্ত দশাটি কাজে লাগিয়ে গানে ওই ৩-র ছন্দেই প্রকাশিত হল বলরামের নিয়ন্ত্রণহীন ‘উলোটি-পালোটি’ চলন। তারপর বলরামের মুখ থেকে ‘যেন মধু ঝরিছে’-র বর্ণনা : শ্বেতকমল থেকে হৃদয়কমল, হৃদকমল থেকে নাভিকমল, নাভিকমল থেকে চরণকমল, ‘কমলে কমল মধু বিনিময়’-এর সুরময় আন্দোলন। আসরের মেজাজে এখন এক ভেসে বেড়ানো কৌতুকের প্রাধান্য। এই অবস্থায় সকাল বেলা বলরাম ভাইকে আনতে চলেছেন পুব থেকে পশ্চিমে, গায়কের বর্ণনায় সেই বলরাম

জীবন্ত হয়ে উঠছেন শ্রোতার কাছে। শ্রোতারা গায়কের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন বলরামের সামনে রাস্তার ওপর তাঁরই দীর্ঘ ছায়া, বলরাম সেই ছায়াকেই দেখলেন তাঁর শত্রু হিসেবে, সে যেন তাঁর পথ আটকে দাঁড়িয়ে। শুরু হল নিজেরই ছায়ার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ। আর তখনই তাল-ছন্দ বদলে গান শুরু হল, 'নিজ অঙ্গ ছায়া হেরি বলাইদাদা রুখে দাঁড়াল'। সমপদী ৩।৩ অথবা ৪।৪ বিভাগের তালে এই ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয় তাই রুখে দাঁড়ানোর মেজাজটা জোর পেল ৭ মাত্রার বিষমপদী দুঠুকি তালের ৩। ৪ বিভাগে : ব লা ই। দা - দা - / রু খে দাঁ। ড়া - ল - ইত্যাদি। আবার, বলরাম যে তোতলা ছিলেন সেই তথ্য কাজে লাগিয়ে ৩-এর ছন্দে রচিত হল 'কাকাকা কাকাকা কানাইয়া কানাইয়া ঘনঘ নঘন ডা-কে ---'। গল্প আবার ফিরে এল কৃষ্ণ আর যশোদার ঘরে : একদিকে বাৎসল্য রসের টান আর অন্যদিকে সখ্য রসের।

প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা গান হবার পর এই অংশ শেষ করে গায়ক জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ গো ক'টা পর্যন্ত হবে গো?, এখন পৌনে পাঁচটা', আয়োজক উত্তর দিলেন, 'পাঁচটা'। 'ও, তাহলে তো তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয়'। এবার শুরু হল মিলন অংশ : রাধারাণীর আবির্ভাব ও এই প্রথম গানে ৪। ৪ ছন্দের প্রয়োগ। এতক্ষণ পর্যন্ত বাৎসল্য আর সখ্য রসের টানাটানি ছিল, 'মা টানে ঘর পানে, রাখাল টানে বন পানে', এখন এর সঙ্গে যুক্ত হল মধুর রস, 'রাই টানে নয়নে, নয়নে, নয়নে গো'। ফিরে এল দুঠুকি তালের ৩। ৪-এর ঝোঁক। মা আর রাখালের টানের সাঙ্গীতিক রূপ পেল এই ৭ মাত্রার তালের দুই দুই করে চার আবর্তন : মা - -। টা - নে - / ঘ - র। পা - নে -, আর রাইয়ের টান পেল একাই চার আবর্তন : রা ই টা নে / ন - - । য় - নে - / ন - - । য় - নে - / ন - - । য় - নে - / গো - - । রা ই টা নে ...। কত আদরে কত নরম করে ফিরে ফিরে, নানান ভাবে এই পদ গেয়ে চললেন গায়ক ; কি তার মাধুর্য! ২০-২৫ মিনিটে মিলন পর্ব শেষ করে রাধাগোবিন্দ মিলন দিয়ে শেষ হল গান। গান শেষ হল অথচ শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে কোনও অসম্পূর্ণতার বোধ রইল না। গায়ক ঐটুকু সময়েই গান শেষ করলেন আর তার মধ্যেই গান পূর্ণতা পেল।

এও এই সঙ্গীতচর্চার বৈশিষ্ট্য : যাঁরা গান-বাজনা চর্চা করেন তাঁরা জানেন কত সাধনা, কত চর্চা, কত অভিজ্ঞতার পর শিল্পী অর্জন করেন এই ক্ষমতা!

অনেকে মনে করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম অথবা জীবনচর্যা তার তাৎপর্য হারিয়েছে কয়েক শো বছর আগেই যদিও আমরা জানি আজও বৈষ্ণব জীবনযাপন করেন এমন ব্যক্তি, পরিবার ও জনপদের সংখ্যা খুব কম নয়। কাঁদরার সাঁজি উৎসব ও মেলা, মঙ্গলঠাকুরের তিরোধান তিথি উপলক্ষে কীর্তন মহোৎসব, ময়নাডালের নন্দোৎসব, অন্নকূট উৎসব, মুলুকের শ্রীপাটে রামকানাই গোষ্ঠমেলা ও মহোৎসব ইত্যাদি আজও বহু সাধারণ মানুষের উৎসাহে ও অংশগ্রহণে আনন্দময় হয়ে ওঠে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনচর্যার তাৎপর্যের ব্যাপকতা হয়ত দুর্বল হয়েছে, কিন্তু যাপনে তার প্রভাব সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মজাত বাংলা কীর্তনের ধারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে আজও সজীব। কীর্তনের চর্চা সঙ্কুচিত হয়েছে, সঙ্কীর্ণ হয়েছে তবু অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। যায়নি, তার কারণ হয়তো এই যে সহজ, অনাড়ম্বর, ভক্তি রসে ভরা এক জীবনযাপনের দীর্ঘ ঐতিহ্য আজও কিছু কিছু জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করে ; নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেওয়াতেই তাঁদের আনন্দ, জীবনের সার্থকতা।

চৈতন্য পূর্ববর্তী বহু-বিভক্ত সমাজ বাংলায় ফিরে আসতে সময় নেয় নি বেশি ; চৈতন্য পরবর্তী যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজই ভেঙে যায় বিভিন্ন বিরোধী সম্প্রদায়ে। এই রকম দার্শনিক, সাম্প্রদায়িক, সামাজিক ভাঙাগড়ার মধ্যেই দীর্ঘ কয়েক শো বছর ধরে চলে কীর্তনের নির্মাণ। আজকে যখন আমরা আহ্বান আর প্রেমের বদলে আহরণ আর বিদ্বেষকেই করেছি জীবনের ভিত্তিভূমি, যখন ‘নাম’ গানের স্থান দখল করেছে ‘আমি’ গান, কেমন করে বেঁচে থাকতে পারে কীর্তনের চর্চা আজকের এই আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজে? প্রেমের সততা, তত্ত্বের অধ্যয়ন, শাস্ত্র পাঠ, সাহিত্য চর্চা, কাব্য রসের বোধ, গল্পবলা-অভিনয়-নাচের শিক্ষা, সঙ্গীতের নির্দিষ্ট ঐতিহ্যগত চর্চা না থাকলে কীর্তন গাওয়া সম্ভব নয়, না সম্ভব ঐ রকম কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়া। গায়করা যে আখরের ও খোল বাদকরা

যে কাটানের পরিসর পান, তা তো একেবারে নিজের রসবোধ দিয়েই ভরতে হয়। এই রসবোধের জন্ম দিতে পারে অন্যান্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত এক সহজ জীবনযাপন : বেশভূষা, খাদ্যাভ্যাস, মাছ ধরা, গাছে চড়া, দোহন, উপাসনা ইত্যাদি পর্যন্ত যা বিস্তৃত। ঐতিহ্যের পরম্পরা একবার বিঘ্নিত হলে সেই পরম্পরা সচলতা হারায়। জীবনযাপনে-দর্শনে-আচরণে যদি পরম্পরার মালা ছিঁড়ে যায়, তাহলে পরম্পরাগত শিল্পকে সংরক্ষণ করা হয়ত সম্ভব কিন্তু সজীব রাখা সম্ভব হয় না। সে-মালা যে আজও সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যায়নি তার প্রমাণ আজকের কীর্তনগান চর্চা।

আধুনিকতাবাদের উন্মাদনায় যখন ঐতিহ্যকে বর্জন করাই এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ নেয়, পরম্পরার মালা রক্ষায় তখন আরও অনেক কিছুর সঙ্গে বুঝে নিতে হয় আধুনিকতাবাদের মতলবকেও। আর, এই পটভূমিতে আধুনিকতাবাদের উদ্ভব, গঠন ও চলনের স্বরূপ অনুধাবন করা হয়ে ওঠে জরুরি।

আধুনিক আধুনিকতা আধুনিকতাবাদ

পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে রোমান ও পেগান অতীত থেকে বর্তমান খ্রীষ্টীয় যুগকে পৃথক করতে জন্ম হয় আধুনিক বা মডার্ন শব্দের।[১] এই শব্দটি সেই থেকেই ইয়োরোপে বারবার ফিরে এসেছে নতুন যুগের চেতনাকে অতীত চেতনার থেকে পৃথক করার সূত্রে। দ্বাদশ শতাব্দীতে চার্লস্ দ্য গ্রেট-এর রাজত্বকালে মানুষ যেমন নিজেদের আধুনিক বলে চিহ্নিত করেছে, তেমনই সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সেও নতুন করে ফিরে এসেছে এই শব্দ। পুরোনোর সঙ্গে যখনই নতুন ভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখনই এই শব্দের পুনঃপ্রয়োগ হয়েছে। সাধারণভাবে আধুনিকতা একটি ঐতিহাসিক যুগকে সূচিত করে। আবার অনেকের মতে এটি একটি মেজাজ, ভাব, দৃষ্টিভঙ্গী অথবা বিশ্ববোধ ; আধুনিকতাবাদ, যুক্তিনির্ভর সর্বজনীন এক মানসিকতাকে সমাজ-সংগঠনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করার একটি প্রকল্প। আধুনিকতার আরও অনেক ধরনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায় ; আজও এই বিশেষ ধারণাটি নিয়ে গবেষণাধর্মী চিন্তার ধারা অব্যাহত। আধুনিকতাবাদের বিকাশ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে অসমান : ইংল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সে যে সময়কে আধুনিকতার জন্মলগ্ন বলে ধরে নেওয়া হয় সেই সময়ে এমনকী ইয়োরোপের অন্যত্রও সেই আধুনিকতার লক্ষণ দেখা যায় না। তাই একটি ঐতিহাসিক যুগ হিসেবে আধুনিকতার কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করাও সহজ নয়। সময় যত গড়িয়েছে, নানান পণ্ডিতদের আলোচনায় ততই স্পষ্ট হয়ে

[১] মডার্ন শব্দটির উৎস ল্যাটিন modernus।

উঠেছে ধারণা হিসেবে আধুনিকতার অস্পষ্টতা। ও-দেশে আধুনিকতা, বিভ্রান্তির নানা রঙের পর্ব কাটিয়ে - কখনো ‘এখন’, কখনো ‘অতি সম্প্রতি’, আবার কখনো এমনকী ‘তখন’ - এক সময় ঘোষণা করেছে আধুনিকতার সমাপ্তি।[২]

আধুনিকতা

১৭৮৪ সালে জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্ট ‘এনলাইটেনমেন্ট্ কী?’ প্রশ্নের উত্তরে ওই নামেই একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই রচনায় কান্ট মননের কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেন। এনলাইটেনমেন্ট্ বলতে কান্ট বোঝাতে চেয়েছেন দাসত্ব থেকে মানুষের চিন্তার মুক্তি ; ধীরে ধীরে চিন্তার জগতকে গবেষণাধর্মী যুক্তিনির্ভর করে তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা, অর্থাৎ মানুষের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠা। মানুষের যুক্তিবাদী হয়ে ওঠাই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠা, এনলাইটেনড্ হয়ে ওঠা, সভ্য হয়ে ওঠা। ওই একই প্রবন্ধে, এই লেখার সমকালকে কান্ট্ চিহ্নিত করলেন এনলাইটেনমেন্টের যুগ হিসেবে, এনলাইটেনড্ যুগ হিসেবে নয়। মুক্তচিন্তার উপযোগী এক পরিসরকে মানুষের সামনে মেলে ধরাই অতীত যুগের থেকে কান্টের যুগের মূল তফাৎ।[৩] কান্টের এই সর্বজনীন যুক্তিবাদ, আত্মপর্যালোচনার চর্চা এবং

---

[২] ‘Very quickly, however, ‘modern’ shifts its reference from ‘now’ to ‘just now’ or even ‘then’, and for some time has been a designation always going into the past with which ‘contemporary’ may be contrasted for its presentness. ... the confusion ... which leaves our own deadly seperate era in anonymity becomes less an intellectual problem and more an ideological perspective. By its point of view, all that is left to us is to become post-moderns.’ Raymond Williams, ‘When Was Modernism’, *Politics of Modernism*, Verso, 2007 [1989], p.31

[৩] ‘If we are asked, “Do we now live in an enlightened age?” the answer is, “No”, but we do live in an age of enlightenment. ... we have clear indications that the field has now been opened wherein men may freely deal with these things and

যে-যুগ এই সম্ভাবনার জগতকে উন্মিলিত করেছিল, সেইটিই অনেকের মতে আধুনিকতার মুহূর্ত, আধুনিকতার প্রকল্প।[৪] সাধারণভাবে দেখতে গেলে আধুনিকতা বলতে আজ আমরা যা বুঝি, আধুনিকতার যে লক্ষণগুলি সম্বন্ধে আমরা কখনো উচ্ছ্বসিত, কখনো সন্দিগ্ধ, কখনো বিব্রত, তার সূত্র হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে কান্টের এনলাইটেনমেন্ট্-কেন্দ্রিক চিন্তার কাঠামোয়।[৫]

ধর্মীয় অনুশাসনে ক্লান্ত, বদ্ধ মানুষ মুক্তি পেতে চাইল চিন্তার স্বাধীনতায়, জগতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে, সাবালক হয়ে ওঠার অধিকার অর্জনে। ক্রমে কমে যেতে থাকল ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রের গুরুত্ব, নতুন যুগের মানুষ, জগৎ ও সত্তার ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রশ্নহীন ভাবে আর মেনে নিতে চাইলেন না ; সাক্ষর-শিক্ষিত মানুষের জীবন থেকে পরিত্যক্ত হতে থাকল বিভিন্ন ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান। ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারের জগৎ যত দুর্বল হতে থাকল, সমাজের সর্বত্র যুক্তিবাদের প্রাধান্য ততই প্রতিষ্ঠা পেল। বিশ্ববোধের সামগ্রিকতাকে ধারণ করতে পারত যে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জগৎ, তার

---

that the obstacles to general enlightenment or the release from self-imposed tutelage are gradually being reduced. In this respect, this is the age of enlightenment...' Immanuel Kant, "What is Enlightenment?", 1784.

[৪] 'The project of modernity formulated in the 18th century by the philosophers of the Enlightenment consisted in their efforts to develop objective science, universal morality and law, and autonomous art, according to their inner logic. At the same time, this project intended to release the cognitive potentials of each of these domains to set them free from their esoteric forms. The Enlightenment philosophers wanted to utilize this accumulation of specialized culture for the enrichment of everyday life, that is to say, for the rational organization of everyday social life.' Jürgen Habermas, 'Modernity versus postmodernity', *New German Critique*, No. 22, Special Issue on Modernism (Winter, 1981). p.9.

[৫] 'The hypothesis I should like to propose is that this little text [Kant's 'What is Enlightenment?'] is located in a sense at the crossroads of critical reflection and reflection on history. ... And, by looking at it this way, it seems to me we may recognize a point of departure: the outline of what one might call the attitude of modernity.' Michel Foucault, 'What is Englightenment?', Paul Rainbow [Ed.] *The Foucault Reader*, Pantheon Books, New York, 1984. p.38.

বিলুপ্তিতে সেই স্থান অধিকার করল তিনটি সম্পর্কিত অথচ স্বাধীন জ্ঞানচর্চার জগৎ : বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ও নন্দনতত্ত্ব। যত দিন গেছে এরা একে অপরের থেকে হয়েছে বিচ্ছিন্ন, নির্মাণ করে নিয়েছে নিজেদের এক স্বশাসিত রাজ্য। সেই রাজ্যে বিচরণ করার যোগ্যতা কেবল বিশেষজ্ঞের, যে বিশেষজ্ঞদের তালিম দেবার দায়িত্ব নতুন ভাবে তৈরি শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের। অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্যও সরে গেছে সাধারণ মানুষের জীবন থেকে। সাধারণ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিল্প-সংস্কৃতি তৈরি করেছে এক বিশেষজ্ঞ-পেশাদার-পরিচালিত মণ্ডল ; সেই শিল্প-মণ্ডলে প্রকৃতি, সমাজ বা জীবন সম্পৃক্ত শিল্পসৃষ্টির কোনও পরিসর বা অবকাশ নেই। 'শিল্পের জন্যই শিল্প', এই তার দর্শন ; সেখানে শিল্পিত হয়ে ওঠাই শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য আর তাকে বিতরণ ও উপভোগ করার একমাত্র অধিকার বিশেষজ্ঞের।

সমসাময়িক সামাজিক সংগঠনের চারিত্রিক ও গুণগত পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক এই রূপের উৎস, এরা একে অপরের পরিপূরক। অষ্ঠাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইয়োরোপে যান্ত্রিক সভ্যতা ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে, সেই নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা মানুষে মানুষে সম্পর্কিত হবার প্রক্রিয়াকে বদল করতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যেই এই নতুন সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মানব সমাজের নতুন সংগঠন পরিষ্কার একটি রূপ নেয় : জন্ম হয় মহানগরের। প্রধানত জীবিকার সন্ধানে চারিদিক থেকে মানুষ এসে বসবাস করতে শুরু করেন মহানগরে। বাড়তে থাকে একে অপরের অপরিচিত, সাধারণ ব্যক্তিদের সমাবেশ আর ঘনত্ব। এর প্রভাব লক্ষ করা যায় যাপনের সমস্ত পরিধির মধ্যেই। দূর দূরান্ত থেকে ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি জগতের মানুষেরা জড়ো হতে থাকেন এই সব নাগরিক কেন্দ্রে, যুক্ত হয়ে যান অপরিচিত একটি সামাজিক সংগঠনের কাঠামোয়, ঢুকে যান, পেশা অনুযায়ী তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট খাপে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করে নেয় এমনই একটা জনসমাজ যেখানে, বিজ্ঞান বা টেক্নলজি, সামাজিক অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞাপন অথবা বাজার, সর্বত্র বইতে থাকে নতুন আবিষ্কারের জোয়ার। পাশাপাশি চলতে থাকে আরেক কর্মকাণ্ড : ঐতিহ্য ও পরম্পরা থেকে নতুন এই সমাজকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার নেশা।

জ্ঞানচর্চার জগতের মতনই সামাজিক স্তরও বিভিন্ন ছোটো ছোটো পরিসরে বিভক্ত হয়ে তৈরি করে নেয় নিজেদের স্বশাসিত রাজ্য। 'শিল্পের জন্যই শিল্প'-র পাশাপাশি জন্ম নেয় সমাজজীবন ও সমাজকল্যাণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 'মুনাফার জন্যই মুনাফা'-র মত ধারণা।

মানুষে মানুষে মিলনের আদর্শে দীর্ঘদিন ধরে যে সমাজ, যে যৌথ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, মহানগরে দেশান্তরীদের সমাবেশে সেই সমাজ ভেঙে নতুন এক জনজগৎ তৈরি হল। ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা মুক্ত মানুষ, হারালো মানুষের রাজ্যকে ; শিল্পী, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদরা এই রাজ্য বা সমাজের বোধ ফিরে পেলেন তাঁদের সৃষ্ট শিল্পের উপকরণের জগতে। আবিস্কৃত হল উপকরণের জগৎ, রাজ্য বা সমাজ।[৬] স্বশাসিত এই উপকরণের জগৎ, উপকরণকেই তখন করে তুলল শিল্পের বিষয়বস্তু। প্রকৃতি, সমাজ বা মানবজগতের উপস্থাপনার বদলে উপস্থাপনাই হয়ে উঠল আধুনিক শিল্পের মূল মনোযোগের বিষয় : চিত্রকলা নিজেই হয়ে উঠল চিত্রকলার বিষয়। সচেতন ভাবেই সঙ্গীত হল শব্দের সমাহার : শব্দই বিষয়, শব্দই ভাষা ; ধ্বনিই সঙ্গীতের শুরু এবং ধ্বনিই তার পরিণতি।

ধনতন্ত্র ও আধুনিকতার বিকাশের যুগে সাংস্কৃতিক পরিসরের সব স্তরেই - সৃষ্টি, বিতরণ ও উপভোগ - বিশেষজ্ঞ এবং পেশাদারের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল। পেশাদারীত্বের দাবি অনুযায়ী শিল্প পণ্যে রূপান্তরিত ; শিল্পসৃষ্টির বিনিময় মূল্য জীবিকা নির্বাহের প্রধান নির্ভর অর্থাৎ সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। 'শিল্পের জন্যই শিল্প'-র তত্ত্ব অনায়াসে খাপে খাপে মিশে গেল 'মুনাফার জন্যই মুনাফা'-র তত্ত্বে। যদিও আধুনিকতার এই প্রসারকে সমসময়েই জোরালো বিকল্প শিল্পচর্চার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ধনতন্ত্রকে যেমন মুখোমুখি হতে হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের, সাংস্কৃতিক আধুনিকতাকেও তেমন মোকাবিলা করতে হয়েছিল বাস্তববাদের সঙ্গে। বাস্তববাদীদের মধ্যে

---

[৬] 'Liberated or breaking from their national or provincial cultures, ... the artists and writers and thinkers of this phase found the only community available to them: a community of the medium; of their own practices.' Raymond Williams, 'The Emergence of Modernism', *Politics of Modernism*, Verso, 2007 [1989], p.45

বাস্তববাদ বনাম আধুনিকতাবাদ নিয়ে তাত্ত্বিক বিতর্ক নন্দন-তাত্ত্বিকদের কাছে আজও গুরুত্বপূর্ণ।[৭] রিয়্যালিস্ট্ বা বাস্তববাদী শিল্পের মূল উৎস সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তব। এই বাস্তববাদের ধারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে লগ্ন হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে চেয়েছিল সমালোচনামূলক বাস্তববাদ, সামাজিক বাস্তববাদ হয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মধ্যে।[৮] দক্ষিণপন্থীদের কাজ যদি হয়ে থাকে ধ্বংস, শোষণ বা রাজনীতির সৌন্দর্যায়ন, বামপন্থীরা সেখানে ক্রিয়াশীল থাকেন রাজনৈতিক শিল্পের নির্মাণে।[৯]

বিশেষজ্ঞ-ভিত্তিক, নগর-কেন্দ্রিক, গ্যালারি-অডিটোরিয়াম-মুখী, প্রকৃতি ও সমাজ নিরপেক্ষ আধুনিক শিল্পচর্চার এই সঙ্কীর্ণ পরিসরে শিল্পীরা এক সময় হাঁপিয়ে উঠলেন। আধুনিকতাবাদ প্রায় একশো বছর ধরে যে অন্ধ বিশ্বাসে আবদ্ধ হল তা ধর্মীয় আবদ্ধতার থেকেও তীব্র আকার নেওয়ায় শিল্পীরা এক শিল্প-বিরোধী আন্দোলনে মেতে উঠলেন। আধুনিক শিল্প যে সমাজে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, তাৎপর্য হারিয়েছে, নতুন এই দাদা-সুরিয়্যালিস্ট্ অথবা আভোঁ গার্ড শিল্প তারই উপস্থাপনা। যা কিছুকে আধুনিক তাত্ত্বিকরা শিল্পের স্বীকৃতি দেন তার সবটাই বুর্জোয়া-ধনী-বিশেষজ্ঞের সম্পত্তি বিবেচনায় সম্পূর্ণ বর্জিত হল। যদিও এই আভোঁ গার্ড শিল্পীরা কেউ নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপন বর্জন করলেন না, সাধারণ মানুষের কাছেও তাঁদের শিল্পসৃষ্টির কোনও মূল্য রইল না ; এঁরা পড়ে রইলেন আধুনিক সমাজ সংগঠনের, সাংস্কৃতিক পরিসরের পরিধিতে, প্রান্তে। আর এর ঠিক উল্টো দিকে বেড়ে উঠতে থাকল পপুলার আর্টের জগৎ। আভোঁ গার্ড

[৭] Fredric Jameson, 'Reflections in Conclusion', *Aesthetics and Politics*, Verso [1977]. 2007, London, New York. pp. 196-213 দ্রষ্টব্য।

[৮] রিয়্যালিজমের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, Georg Lukács, *The Meaning of Contemporary Realism*, Merlin Press, London, 1963.

[৯] 'Its [Mankind's] self-alienation has reached such a degree that it can experience its own destruction as an aesthetic pleasure of the firsr order. This is the situation of politics which Fascism is rendering aesthetic. Communism responds by politicizing art.' Walter Benjamin, 'The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction' [1935], *Illuminations*, Fontana/Collins, 1982. p. 244.

আধুনিকতার মূল কর্মকাণ্ডের এক প্রান্তে সক্রিয় আর অন্য প্রান্তে সম দূরত্বে অবস্থিত পপুলার আর্টের কর্মকাণ্ড : ক্যালেন্ডার আর্ট, ট্রাকের পিছনের ছবি ও বাণী, ফিল্মি গান, সিনেমার পোস্টার, পর্নোগ্রাফি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। একে অপরের থেকে পৃথক ও আপাত-বিরোধী হয়েও সবটা মিলিয়েই আধুনিকতার পরিসর ; আভোঁ গার্ড ও পপুলার দুটিই আধুনিক অর্থাৎ নগর, যন্ত্র ও বাজার সভ্যতা নির্ভর কর্মকাণ্ড। ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতা ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্র বিভিন্ন সমাজের জন্য নির্দিষ্ট করে দিল নানা প্রকার সংস্কৃতি চর্চার ভূমি আর তার বাজার। শিল্পবস্তুর আর কোনও ব্যবহারিক মূল্য রইল না ; তার অস্তিত্ব, প্রাসঙ্গিকতা এবং তাৎপর্য কেবল তার বিনিময় মূল্যে।

বিংশ শতাব্দীর ষাট-সত্তর দশকের মধ্যে ইয়োরোপ ও অ্যামেরিকার দেশগুলিতে আধুনিকতার তাত্ত্বিক ভিত্তি ও দাবি ভেঙে পড়তে থাকে। মানুষের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার এনলাইটেনমেন্ট্ প্রকল্পটি নিঃশব্দে প্রসারিত হয়ে যায় ক্ষমতা বিস্তারের অস্ত্র হিসেবে। এক বিশেষ জাতির পুরুষ সমাজের যুক্তি-প্রক্রিয়া স্থান-কাল-সংস্কৃতি নির্বিশেষে চাপিয়ে দেওয়া হয় অন্য সকল সমাজে। পাশ্চাত্য ধনী দেশগুলির উচ্চবর্গের প্রতিনিধিরা তৈরি করেন তাঁদের প্রয়োজন মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষক-বিশেষজ্ঞের দল। এই বিশেষ দল নির্মাণ করে নেয় জ্ঞানের জগতের এক গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ[১০] : নিজেদের যুক্তিবিদ্যাকে সর্বজনীন দাবি করে চাপিয়ে দেওয়া হয় বিশ্বের সর্বত্র। ক্ষমতা তন্ত্রের এই রূপটির বিরুদ্ধে যে নান্দনিক চর্চা ও চিন্তাধারার বিকাশ, সেইটিই অনেকের মতে উত্তর-আধুনিকতা।

ধনতান্ত্রিক বিকাশের এই নতুন পর্বকে অনেকে পোস্ট-ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, বিরোধকে মূল রাষ্ট্র কাঠামো এবং ক্ষমতা তন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য এবং প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবে আত্মসাৎ করাই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগ থেকে পোস্ট-ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগের প্রধান প্রভেদ। রাষ্ট্র ও সমাজ সংগঠনের এই গুনগত পরিবর্তন প্রভাব ফেলে নতুন যুগের

---

[১০] Jean-François Lyotard, 'Introduction', *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, Manchester University Press, 1984 দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃতি-চর্চায়, জন্ম নেয় সংস্কৃতির 'নতুন' কাঠামো। এই 'নতুন' যুগ ঘোষণা করেছে 'প্রতিভা'-র বিলুপ্তি, 'বিশেষায়ন'-এর সমাপ্তি। শিল্পের উঁচু-নিচু, সুক্ষ্ম-স্থূল ভেদ এই যুগে বর্জনীয়। শিল্পকলাকে পবিত্রতার সীমা দিয়ে ঘিরে নির্দিষ্ট একটি বিশুদ্ধ আঙ্গিক যেমন গান, চিত্রকলা, বাজনা, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদির মধ্যে বন্দী করে রাখা নিন্দনীয়। দৃশ্যশিল্প দৃশ্য-সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত, সঙ্গীত ধ্বনি-সংস্কৃতিতে : পোস্ট-মডার্নিজম্ লেট্ ক্যাপিটালিজমের সাংস্কৃতিক যুক্তি-ছন্দের ব্যবহারিক রূপ।[১১]

আমাদের আধুনিকতা

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকেই আধুনিকতাবাদের সর্বজনীন যুক্তিবাদ, 'বৈজ্ঞানিক' চিন্তা, প্রগতি-বৃদ্ধি-উন্নয়ন ইত্যাদির আধুনিক ধারণা সর্বত্র বিস্তারিত হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে সভ্যতার উৎকর্ষ ও মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অনাধুনিক পৃথিবীর দেশগুলিকে 'সভ্য' করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ইয়োরোপের ধনী দেশগুলি নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে উপনিবেশগুলিতে। দেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনন ও কল্পনা শক্তিও অজান্তে-নিঃশব্দে রূপান্তরিত হয়ে যায় ইয়োরোপের উপনিবেশে।[১২] বিশ্বের সকল মানুষের মনন-চিন্তনের পরিসর শাসনের পুণ্য দায়িত্ব নিজেদের কর্তব্যজ্ঞানে গ্রহণ করে নেয় ইয়োরোপের এই দেশগুলি। ঔপনিবেশিক যুগেই ইয়োরোপে উদ্ভূত আধুনিকতার ধারণা এসে পৌঁছয় এই দেশগুলিতে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ সংগঠন, রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতি - সমাজের সব স্তরেই আধুনিকতার প্রভাব অনুভুত ও অনুসৃত

---

[১১] Fredric Jameson, 'Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism', *New Left Review,* July-August 1984, pp. 53-93.

[১২] ধারণার ঔপনিবেশিকীকরণের প্রক্রিয়ার স্বরূপটি বুঝবার জন্য দ্রষ্টব্য, Krishnachandra Bhattacharya, 'Swaraj in Ideas', 1928-30, *Visva Bharati Quarterly*, Vol. XX, No.2, 1954.

হতে থাকে। নতুন গড়ে ওঠা নাগরিক মননের গভীরে আধুনিকতা তার স্থায়ী আসন পেতে নেয়।

ইয়োরোপিয় ঔপনিবেশিক শক্তি সাবধানী ও হিসেবি চাতুর্যে উপনিবেশের মানুষকে নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতে, জীবনাচরণ-আচার-অনুষ্ঠানকে কুসংস্কার ও অন্ধকার জগৎ বলে অসম্মান করতে শেখাতে সক্ষম হয়। এ যে কেবল ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সত্য তা নয়, এশিয়ার অন্যত্র, অ্যামেরিকা এবং আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতেও ওপর থেকে চাপানো এই আধুনিকতার সঙ্গে দেশজ সংস্কৃতির, দেশজ জীবনদর্শনের সংঘাত লক্ষণীয়।[১৩] দেশজ পরম্পরার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হওয়ার ফলে দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার বোঝাপড়া কোনও দিনই স্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারেনি ; বন্ধুত্বের মানসিকতায় গড়ে তুলতে পারেনি কোনও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য।

বৌদ্ধিক ও তাত্ত্বিক জগতে আধুনিকতার ধারণা নিয়ে যতই বিভ্রান্তি থাকুক না কেন, সাধারণভাবে এই শব্দ ব্যবহারের একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। আধুনিক মানে উন্নত - ধনী দেশে যা চলে তাই, মানে ওয়েস্টার্ন অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল। আধুনিক মানে নতুন ও সাম্প্রতিকতম : নতুন আর সাম্প্রতিক মানেই উন্নত ; উন্নত মানেই সম্ভ্রান্ত, ফরসা, লম্বা, ইংরিজি জানা। 'ওদের পরিবার খুব মডার্ন, ওরা বাপ-ব্যাটা একসঙ্গে বসে মদ-সিগারেট খায়, মাকে ডাকে মামি বলে আর মামিকে বলে আন্টি', 'ওই আর্ট কলেজ খুব মডার্ন, ওখানে ছাত্রছাত্রীরা মাস্টারমশাইদের নাম ধরে ডাকে', 'ওটা আমাদের দেশের সবথেকে আধুনিক ইউনিভার্সিটি, ওখানে ছেলেদের হস্টেলে মেয়েদের আর মেয়েদের হস্টেলে ছেলেদের অবাধ প্রবেশাধিকার'।

---

[১৩] আফ্রিকা এবং ল্যাটিন অ্যামেরিকার প্রেক্ষাপটে আধুনিকতার ভূমিকা বিচারের জন্য দ্রষ্টব্য, Frantz Fanon, 'On National Culture', [Statement made at the Second Congress of Black Artists and Writers, Rome, 1959]. *The Wretched of the Earth*, Penguin. 2001, Octavio Paz, 'The Antimodern Tradition', *One Earth, Four or Five Worlds,* Harvest/HBJ Books. 1986, *Poetry and Modernity,* The Tanner Lectures on Human Values Delivered at The University of Utah. October 18-20, 1989, Gabriel García Márquez, 'Our Own Brand of Socialism', *New Left Review* 138, 1983.

আমাদের মতন দেশে 'আমাদের আধুনিকতা' বলে একটি কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়।[১৪] এই 'আমাদের' শব্দটি এমনই এক ধারণা বা সমস্যা যা প্রসারিত অথবা সঙ্কুচিত হয়ে ভারতীয় থেকে দ্রাবিড়-বাঙালি-মণিপুরি ইত্যাদি হয়ে পৌঁছতে পারে এমনকী আঞ্চলিক যেমন, বীরভূমি আধুনিকতা অবধি।[১৫] সেখানেও সে থেমে থাকতে পারে না, দিন যত গড়ায় ততই সে গড়ে তুলতে থাকে 'নেহেরুভিয়ান' ইত্যাদি ব্যক্তি কেন্দ্রিক আধুনিকতার ধারণা অথবা 'চাটুজ্জে-চক্কোত্তি-ভটচাজ্', 'মধ্যবিত্ত-বাবু', 'দলিত' ইত্যাদি বর্গভিত্তিক আধুনিকতার রূপ। আমাদের মতন দেশে, যে-দেশ আধুনিকতার জন্মভূমি নয় অথচ যেখানকার মানুষেরা বাধ্যত অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে আধুনিকতার চর্চা করেন, সেখানে আধুনিকতার কোনও সাধারণ সংজ্ঞা

---

[১৪] যেমন, 'বিশ্বজনীন আধুনিকতার প্রাঙ্গণে আমরা ব্রাত্য, চণ্ডাল। আমাদের কাছে সে আধুনিকতার মানে বিদেশি জিনিসের ফ্যান্সি মার্কেট। আধুনিকতার উৎপাদক হিসেবে সেখানে কেউ আমাদের পোঁছে না। ...কিন্তু আমরা আধুনিক হতে চাই বলেই আমাদের স্বাতন্ত্র্য জাহির করার ইচ্ছা, সৃজনশীল হওয়ার ইচ্ছা প্রক্ষিপ্ত হয়ে যায় অতীতে। ...
নিজেদের বিশিষ্ট আধুনিকতার রূপগুলি উদ্ভাবন করতে গেলে অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত আধুনিকতাকে সময় সময় বর্জন করার সাহস দেখাতে হয়। জাতীয়তাবাদের যুগে এ ধরনের বহু প্রচেষ্টা হয়েছিল। ...আজ গ্লোবালাইজেশনের যুগে হয়ত নতুন করে সাহস দেখাবার সময় এসেছে। তাই আমাদের আধুনিকতার সেকাল আর একাল নিয়েও বোধহয় আমাদের ভাবনা শুরু করা উচিত।' পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'আমাদের আধুনিকতা', *ইতিহাসের উত্তরাধিকার,* আনন্দ, কলকাতা। ২০০০। পৃ. ১৮৪, অথবা '...it may be worth mentioning that modernism as it develops in postcolonial cultures has the oldest retroactive trajctories, and that these make up a parallel aesthetics. ... We should see our trajectories crisscrossing the western mainstream and, in their very disalignment from it, making up the ground that restructure the international.' Geeta Kapur, 'When was Modernism in Indian Art', *When was Modernism,* Tulika, New Delhi, 2000. p. 297

[১৫] যেমন, 'Primary among the ideas they [Rabindranath, Nandalal, Benodebehari and Ramkinkar] shared was ... a comprehensive rethinking not a revival of the past in form or spirit. ... They also understood that such rethinking held the key to modernism and the new developments in art concept and practice, we call modernism, have to be contextual or related to history and environment'. R. Siva Kumar, 'Santiniketan: The Making of a Contextual Modernism' Exhibition Catalogue. National Gallery of Modern Art, New Delhi. 1997.

নির্ণয় করা যায় না। বাইরে থেকে আসা, ওপর থেকে চাপানো এই ধারণা ও তার চর্চা এ-দেশের জীবনযাপন ও সংস্কৃতির সঙ্গে সর্বত্র খাপে খাপে বসে না। আর তখনই গড়ে ওঠে আধুনিকতার এই বিচিত্র রূপ। এই 'আমাদের' শব্দটা তখন ব্যবহারের পার্থক্যে তৈরি করে নেয় বিভিন্ন 'আমাদের'-কে।

আমরা যাই করি না কেন তাকে হতেই হবে আধুনিক, না হলে তা আজকের সমাজে বর্জিত : আধুনিক মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, মডার্ন হাইস্কুল, আধুনিক পোষাক বিপণি, মডার্ন হেয়ার কাটিং সেলুন, অত্যাধুনিক নার্সিং হোম ... আধুনিক কবিতা, মডার্ন আর্ট ... আধুনিক মন, আধুনিক শরীর ... আরও কত কী। এই সব ক্ষেত্রে 'আধুনিক' স্পষ্টতই একটি মেজাজ, একটি দৃষ্টিভঙ্গী ; এখানে 'আধুনিক'-এর বোধ কোনও কাল বা ঐতিহাসিক যুগের প্রতিনিধিত্ব করে না। সাধারণ ভাবে ভাবলে দেখা যাবে আধুনিক শব্দটির একটি প্রধান অর্থ হল সাম্প্রতিক আবার অন্যদিকে আধুনিক শব্দটির আরেকটি প্রধান অর্থ হল অভিনবত্ব ; অথচ যা কিছুই সাম্প্রতিক ও অভিনব তাকেই আধুনিক বলে চিহ্নিত করেন না আধুনিকতাবাদীরা। নাগরিক সংস্কৃতি-মণ্ডলের বাইরে কীর্তন, কবিগান, পঞ্চরস, ব্রত-পার্বন, চড়ক, মেলা ইত্যাদি এখনও সচল ; ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রতি নিয়ত নিজেকে গড়ে তুলছে নতুন রূপে, অথচ আধুনিকতাবাদীদের কাছে এই সব সংস্কৃতিচর্চা প্রাক্-আধুনিক বলেই গৃহীত। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে আধুনিক শব্দটি কি কালসাপেক্ষ না কালনিরপেক্ষ? আধুনিক শব্দটির প্রধান অর্থ ও ভার যে বিশেষ একটি বিশ্বদর্শন তা আর আজ গোপন করার উপায় আছে কি? সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য চিন্তা-কাঠামো সমগ্র পৃথিবীকে এক সময় গ্রাস করে নেয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করে তার শ্রেষ্ঠত্ব : পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-দর্শন, পাশ্চাত্য শিল্প-রুচি এক অভাবনীয় সর্বজনগ্রাহ্যতা অর্জন করে। এই পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীই আমাদের কাছে আধুনিক নয় কি? শিক্ষাপদ্ধতি, মিষ্টি ও পোষাকের দোকান, কবিতা, আর্ট... এইগুলির আগে একটি করে 'আধুনিক' জুড়ে দেবার অর্থ কি তাই নয়? আমাদের সমাজ সংগঠনের, আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বর্জন

করে সেই জায়গা পাশ্চাত্য রুচি ও পদ্ধতি দিয়ে ভরাট করে দিলে তবেই তা হবে যথার্থ আধুনিক। ভাষা রইল বাংলা আর তার সাঙ্গীতিক নির্মাণ, সংরক্ষণ পদ্ধতি ও বিতরণ ব্যবস্থা ভরাট করল আধুনিকতা। 'আমাদের' অর্থাৎ বাংলা ভাষা, 'আধুনিকতা' মানে গিটার, সিন্থেসাইজার, ড্রাম সেট, পারকাশন ; গান ও বাজনার স্বরলিপিকরণ ; বিনিময় মূল্যে সে-গানবাজনা শোনার একমাত্র ব্যবস্থা অডিটোরিয়াম অথবা রেকর্ডে। দুয়ে মিলে 'আমাদের আধুনিকতা', তাই হল না কি?

গ্রাম থেকে লোকশিল্পী এনে তাঁদের শহরের বদ্ধ ঘরে ঢুকিয়ে, সেই ঘরে শ্রোতাদের বসবার অংশ অন্ধকার করে, গাইয়েদের পিছনে উন্মাদের মত শরীর কাঁপিয়ে ড্রাম সেট্ আর গিটার বাজিয়ে, অসংলগ্ন ও অপ্রাসঙ্গিক রঙিন আলো জ্বালিয়ে নিবিয়ে উপস্থাপনা ; গ্রামীন কাঁথাশিল্পী ও কারিগরী ব্যবহার করে শহুরে রুচির ডিজাইন দিয়ে টি-শার্ট, শাড়ি, পাঞ্জাবি বানিয়ে বিপণির মাধ্যমে তা বিক্রি করার ব্যবস্থা : এ হল দেশজ সংস্কৃতির আধুনিকীকরণ বা মডার্নাইজেশনের একদিক। অন্যদিকে পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিল্পচর্চার অনুকরণে নিজেদের প্রতিষ্ঠান ও চর্চাকে গড়ে তোলার প্রয়াস : আমাদের প্রিন্সটন, আমাদের পর্নোগ্রাফি, আমাদের পিকাসো ইত্যাদি। সংস্কৃতি চর্চাকে যাপনের ভিত্তি থেকে তুলে বাজারভিত্তিক করে তোলার প্রক্রিয়াকে যাঁরা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন তাঁরা একেই মনে করেন ফোক্ গান, ফোক্ ক্রাফট্, ফোক্ কালচারকে বাঁচিয়ে রাখা। বুঝতে দেন না এর গভীরে আরেক স্তরের অন্য এক প্রক্রিয়াকে : যা বেঁচে থাকে তা হল শিল্পের বাহ্যিক রূপ, মরতে থাকে এই রূপের উৎস এক সহজ ও টেকসই জীবনচর্চা। অন্যদিকে আমাদের কেম্ব্রিজ, আমাদের হার্ভার্ডের মত উচ্চফলনশীল বুদ্ধিজীবী প্রতিষ্ঠানে, ১৮৩৫ সালে টি বি মেকলে-র প্রদর্শিত পথে উৎপন্ন বুদ্ধিজীবীরা,[১৬] শিক্ষক-শিক্ষার্থী সমাজে ও মননে

---

[১৬] 'it is impossible for us, with our limited means, to attempt to educate the body of the people. We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the million whom we govern, - a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in

প্রতিষ্ঠা করেন পাশ্চাত্য চিন্তা-কাঠামো ও খোলা বাজার ভিত্তিক এক বিশ্বদর্শন ; ক্ষইতে থাকে দেশজ চিন্তা-কাঠামো ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ। আধুনিক, আধুনিকতা বা আধুনিকতাবাদ শব্দগুলি শুনতে যত নিরীহ ও মিষ্টি, প্রয়োগে ও আচরণে ততটা নয় : এই শব্দটির অর্থ, মূল্য, অগ্রাধিকার ও আধিপত্য তাই, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক কর্মীদের মনোযোগ দাবি করে। গোটা পৃথিবী জুড়েই আধুনিকতাবাদ নিয়ে সংশয়ের বাতাবরণ তৈরি হওয়ার পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ দাসত্বের ইতিহাস।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামগুলির তীব্রতা বৃদ্ধি পায় ও একে একে প্রত্যেকটি দেশই ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে। ভারতবর্ষের মতন ইয়োরোপিয় উপনিবেশে, প্রধানত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে ইয়োরোপ থেকে আসা আধুনিকতা, প্রগতি, উন্নয়ন প্রভৃতির ধারণা ও এই ধারণার বিশ্বজনীনতার দাবী প্রশ্নের মুখে পড়ে[১৭]; সমাজ-সংস্কৃতির দেশজ ও বিকল্প বিকাশের সন্ধান শুরু হয়।[১৮]

---

intellect. ... To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population.' T. B. Macaulay, 'Minute on Indian Education', H. Sharp [Ed.], *Selections from Educational Records (1781-1839),* Calcutta, 1920, Available at, http://www.columbia.edu/itc/mealac/prichett/00generallinks/macaulay/text_ minute_education_1835.html

[১৭] 'the domain of the "national" was defined as one that was different from the "Western". The new subjectivity that was constructed here was premised not on a conception of universal humanity, but rather on particularity and difference: the identity of the "national" community as against other communities ... The search for a postcolonial modernity has been tied, from its very birth, with its struggle against modernity.' Partha Chatterjee, *The Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories,* Oxford, Delhi, 1995. p.75

[১৮] শুধুমাত্র বাংলাতেই এমন অনেকগুলি উদ্যোগের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal* [Second Edition], Permanent Black, Ranikhet, 2010.

দেশজ জীবনযাপন ও সংস্কৃতির আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া যত তীব্র হয়েছে, সনাতনপন্থীরা ততই হিংস্রভাবে জেগে উঠেছেন ঐতিহ্য রক্ষায়, অতীত সংস্কার আগলানোয়। এঁরা বিশ্বাস করেন অতীত সমাজসংগঠন-শিল্প-কাব্য-সঙ্গীত ইত্যাদির স্থির অচল বাহ্যিক রূপে, সেই বাহ্যিক রূপ রক্ষা করার উদ্বেগ ও উগ্রতা তাদের টেনে নিয়ে গেছে অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার দিকে ; ঐতিহ্যের স্বাভাবিক বিকাশের দিকে নয়। ব্রাহ্মণ্য-উচ্চবর্গীয়-সনাতন হিন্দু সভ্যতাকেই ভারতীয় সভ্যতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তারই পুনর্জাগরণের নেশায় মেতে উঠেছেন এঁরা। সচেতন ভাবেই বর্জিত হয়েছে অবৈদিক, অনার্য, লৌকিক অথবা আদিবাসী জীবনবোধ ও সংস্কৃতি চর্চা। এই মতবাদ বৈচিত্র্য ও সামঞ্জস্যে বিশ্বাসী নয় ; একমুখী, একরোখা এদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁদের মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে তাকে সকলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। খণ্ডিত এই ভারতবোধই যে ক্রমে উগ্র হিন্দুত্ববাদী অথবা হিংস্র মৌলবাদের চেহারা নিল, এ-কথা আজ আর নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না।

আর এরই মাঝখানে পড়ে, ফাঁকতালে ঐতিহ্য তার প্রস্ফুটিত হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল।

ঐতিহ্যের অধিকার

প্রকৃতি ও জীবজগতের সঙ্গে মেলামেশা-বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে পারিপার্শিকের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব। অজানা জগৎ যেমন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে তেমনই তার আরও রহস্যময় ভয়াবহ বৈচিত্র্য ভাবিয়েছে, দুলিয়েছে, ঝাঁকিয়েছে মানুষের মনকে। অন্যদিকে, অন্তর্জগতের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য-চরিত্রের বিশ্লেষণও হয়ে পড়েছে অবশ্যম্ভাবী ; সত্তার স্বরূপ, চৈতন্যর ধর্ম, প্রকাশিত রূপের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্মিত, চিন্তিত, উদ্বিগ্ন হয়েছে মানুষ। এই বন্ধুত্ব - এই বিস্ময়, উদ্বেগ, অন্বেষণ - জগৎ ও জীবনকে করেছে সমৃদ্ধ ও আনন্দময়। আত্মপ্রকাশ, মনুষ্যত্বের সাধনা, চৈতন্য জাগরণের মধ্য দিয়ে মানুষ হতে চেয়েছে পূর্ণতর। মানুষের ক্রমাগত মানুষ হয়ে ওঠাই সভ্যতার ভিত্তি আর এই হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াই ঐতিহ্য।[১]

আবার, সমাজ সংগঠনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে জেগে উঠেছে মানুষের শোষণ করার, লুট করার নেশা। মানবসমাজ বিকশিত হবার কোনও কোনও পথে প্রকৃতি হয়েছে শত্রু, লুণ্ঠনের রাজ্য আর দুর্বল জনগোষ্ঠী হয়েছে শোষণ ও কর্তৃত্ব বিস্তারের লক্ষ্য। আজও এই প্রক্রিয়া সমানভাবে ক্রিয়াশীল। শুধুমাত্র বাংলাই যে কত রকম অত্যাচার, শোষণ ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়েছে সে কথা ভাবলে অবাক হতে হয়।[২] সাংস্কৃতিক মণ্ডলকে অধিকার করে সেখানে নিজেদের সাংস্কৃতিক

---

[১] ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত দার্শনিক বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য, শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ঐতিহ্য, শিল্প ও আধুনিকতা', *এক্ষণ*, ৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা। পৌষ-মাঘ ১৩৭৬ [১৯৭০]

[২] নীহাররঞ্জন রায়, 'দেশ-পরিচয়' ও 'রাজবৃত্ত', *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং,

আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, রাজ্য জয়-বিস্তার-শাসনকে যে অনেক সহজ করে তোলে সে-কথা আমাদের জানা। বাংলাও এর ব্যতিক্রম নয় ; ব্রাহ্মণ্য, জৈন বা বৌদ্ধ সংস্কৃতি যখন বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে চেয়েছে, তখনই বেঁধেছে সঙ্ঘাত। আরও অনেক শতাব্দী পরে যখন মুসলমান ও ইয়োরোপিয় শক্তি স্থাপন করেছে নিজেদের কর্তৃত্ব, তখনও সেই একই প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে বাঙালির। সামরিক শক্তির প্রয়োগ আর এই ঘাত-সঙ্ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শক্তিশালীরা দখল করেছে নতুন দেশ, গ্রাস করেছে তার সংস্কৃতি। প্রভাবশালী শক্তি সংস্কৃতির মূল নির্মাণকে নিজেদের ছন্দে সাজিয়ে তার মধ্যে যুক্ত করেছে স্থানীয় সাংস্কৃতিক উপাদান ; জনসমাজে দেশজ বোধ বাঁচিয়ে রেখে কৌশলে দেশকে করেছে শোষণ। কল্পনা ও মননের দখল নিয়ে চালিত করেছে তাকে নিজেদের মননের ছাঁদে, আর দেশজ সাংস্কৃতিক বোধ জাগ্রত রাখতে ব্যবহার করেছে দেশজ সংস্কৃতির অবয়ব। এই বোধ ভুলিয়েছে কর্তৃত্ব আর শোষণের তীব্রতা।

কিরাণা ঘরানার গুরু ফৈয়াজ আহমেদ খাঁ তাঁর দিল্লিবাসী এক শিষ্যাকে বলেছিলেন, 'আমরা শুনেছি তোমার কর্মক্ষেত্রে তুমি ইংরিজিতে ভাবো, ইংরিজিতে লেখো। আমরা যাকে স্বাভাবিক বাচন বলি তাকে এই চর্চা বিশেষভাবে ক্ষতি করে। ... সঙ্গীত তো পরিশীলিত বাচন, সঙ্গীতের ধ্বনির উৎস আঞ্চলিক দেশজ ভাষা। ... যাদের মাতৃভাষা উর্দু বা হিন্দি, প্রকৃত খেয়াল গাইয়ে হবার সম্ভাবনা অন্যান্যদের তুলনায় তাদের অনেক বেশি।' শিষ্যা এই কথা শুনে ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁর সরকারি চাকরি ; ইংরিজিতে ভাবা, কথা বলা, লেখা - বন্ধ করেছিলেন সবই, ফলও পেয়েছিলেন হাতেনাতে। তাঁর মনে হল ইংরিজি ভাষার আওয়াজ যত তাঁর যাপনের প্রক্রিয়া থেকে সরে যেতে থাকল, সকালের রেওয়াজে গাওয়া সা স্বরের ধ্বনি হতে থাকল ততই শান্ত ও প্রাণবন্ত।[৩] শিষ্যার জীবনে এই ঘটনাটি

কলকাতা। ১৪১০ [২০০৩], এবং Sanjeev Sanyal, 'Kharavela's Revenge' and 'Merchants, Temples and Rice', *The Oacen of Churn,* Penguin. 2016. দ্রষ্টব্য।

[৩] ' "I am told that you studied English ... and that in your job you think and write in English. ... I think that music is just refined speech. It has to draw on sounds

না ঘটলে তাঁর মধ্যে জেগে থাকত এক ভারতবোধ আর ধ্বংস হতে থাকত ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। আজ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নির্মাণকৌশল বা মেজাজ অনেকাংশে দেশজ থাকলেও বদলে গেছে তার চর্চা ; সমসাময়িক কালে জনসমাজ থেকে সরে তা রেডিও-টিভি-রেকর্ড, ইন্টারনেট ও অডিটোরিয়ামে বন্দী। দৃশ্যকলার জগতে যেমন দেখা যায় বাঙালি চাষির ছবিতে তার পোষাক, মাঠ-ঘাট, ঋতু বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির নিখুঁত বিবরণ হয়ত রইল কিন্তু মানবদেহ, গাছ, মাঠ, লাঙল ইত্যাদি দৃশ্যবস্তুর নির্মাণকৌশল গেল বদলে, হয়ে উঠল ইয়োরোপিয় অথবা আধুনিক। সঙ্গীতের মতনই গণপরিসর থেকে সরে এসে গ্যালারির দেওয়ালে ভ্রমণ সেরে শিল্পবস্তু আজ মিউজিয়ামের স্ট্রং রুমে বন্দী। পরবর্তীকালে এই সাংস্কৃতিক রূপটিকেই অনেকে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ বলে ভুল করেছেন এবং এই রূপটিকেই বাঙালির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন।

যখনই শক্তিশালী কোনও জনগোষ্ঠী দুর্বলের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে, তখনই আঞ্চলিক সেই ঐতিহ্য পড়েছে সংকটের মুখে। ঐতিহ্য চলে উল্টো পথে : মাটি, জলবায়ু, জনগোষ্ঠীর যৌথ স্মৃতি আর জীবনযাপনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক নির্মাণ, সেই স্তরে অনবরত চলতে থাকে সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনের খেলা। সংস্কৃতির সেই মূল কাঠামো তাই চুপ করে বসে না থেকে উন্মিলিত হতে থাকে প্রতি মূহুর্তে, আর সেই সংস্কৃতির অঙ্গে যুক্ত হয়ে এই বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে থাকে পৃথিবীর অন্যত্র উদ্ভাবিত সাংস্কৃতিক উপাদান। দেশজ সাংস্কৃতিক কাঠামো মজবুত হলেই

---

from indigenous language of the region. To say that music is a universal language is sentimental, wishful nonsense. Someone whose mother tongue is Urdu or Hindi has better prospect as khayal singer...” ...I gave up my job in the Publication Division and made a conscious effort to speak only in Hindustani or Urdu. ...When I turned off the English switch entirely, the sounds in my head really changed. I felt myself change as a person too. ...I thought that the *sa* I pracitsed in the morning sounded more and more relaxed as the sounds of English leached out of my system.’ Sheila Dhar, *Rag’n Josh*, Permanent Black, Ranikhet. 2015. pp. 132-133.

জন্মায় অন্য সাংস্কৃতিক উপাদান ধারণ করার ক্ষমতা। ঐতিহ্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে নিজেকে জ্যান্ত রাখা, এইখানেই লুকিয়ে আছে ঐতিহ্যের সৃজনশীল স্পন্দন, সংস্কৃতির প্রাণ। সংস্কৃতি স্বাধীন বিকাশের সুযোগ পেলে এই প্রক্রিয়াতেই পূর্ণতা লাভ করে। বাংলার ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি যতবার সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বের আঘাত পেয়েছে ততবারই তাকে পড়তে হয়েছে গভীর সংকটের মুখে। এই সংকট থেকে মুক্তির পথ সে খুঁজে পেয়েছে আত্মপর্যালোচনায়। নিজেকে ভেঙে ভেঙেই এগিয়ে চলে ঐতিহ্য ; মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে সভ্য।

মধ্যযুগের বাংলায় এমনই এক সংকট মুহূর্তে বাংলা কীর্তনের জন্ম। সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব-অধীনতার ডামাডোলের মধ্যেই কেমন করে জানি, তালেগোলে কোনও এক ফাঁকফোঁকর দিয়ে গলে বেরিয়ে বাংলার এই সাঙ্গীতিক রূপ খুঁজে নিয়েছিল তার স্বাধীন পরিসর। সেই থেকে দীর্ঘ এত বছর ধরে বয়ে চলেছে তার সাঙ্গীতিক নির্মাণ - জ্যান্ত থাকার এমন ঘটনা ইতিহাসে খুব বেশি চোখে পড়ে না।

বাংলা কীর্তন : উদ্ভাবন ও রূপবৈচিত্র্য

রাজশাহী জেলার পদ্মার উত্তরে প্রেমতলি গ্রাম, সেখান থেকে দু মাইল ভিতরে খেতরী আর তার কাছেই গোপালপুর। এই গোপালপুরে বাড়ি ছিল নরোত্তমদাস (দত্ত) ঠাকুরের। যৌবনে তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে লোকনাথ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও জীব গোস্বামীর কাছে গোস্বামী সিদ্ধান্ত অধ্যয়ন করেন। বৃন্দাবনে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় বর্ধমান জেলার যাজিগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য এবং মেদিনীপুর জেলার বঙ্গ-উড়িষ্যা-প্রান্তের শ্যামানন্দের। এঁরা তিনজনই গোস্বামী সিদ্ধান্ত চর্চা করেন জীব গোস্বামীর কাছে এবং বঙ্গে ব্রজমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলের সামঞ্জস্য স্থাপনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

বৈষ্ণবসাহিত্য ও কীর্তন গানের গায়ক-বাদক, ঐতিহাসিক এবং গবেষকরা সকলেই মনে করেন নরোত্তমদাস বঙ্গে নতুন এক কীর্তনগায়নরীতির প্রবর্তন

করেন। কীর্তনের এই বিশিষ্ট রূপটির জন্ম হয় ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ অথবা এর কাছাকাছি সময়ে নরোত্তমদাস আয়োজিত বৈষ্ণবদের মহোৎসবে। বৃন্দাবন থেকে ফিরে নরোত্তম খেতরী গ্রামে বসবাস করতে শুরু করেন। রাধা-কৃষ্ণ ও চৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত এই মহোৎসবে নরোত্তমের আমন্ত্রণে ও আহ্বানে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের সব গোষ্ঠীপ্রধানরা। বৃন্দাবনের জ্ঞানচর্চা ও বৈষ্ণবতত্ত্ব খেতরীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রস ও মাধুর্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল সহজেই। বৈষ্ণব সাধনার এই মিলন কীর্তন গানের যে বিশিষ্ট রূপের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করল, তারই নাম গরাণহাটী কীর্তন ; খেতরী গড়ের হাট পরগনায় অবস্থিত বলে এই নামকরণ। প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে উদ্ভাবিত সেদিনের এই কীর্তনরীতির সাঙ্গীতিক রূপটিকে যথাযথভাবে আজ বুঝে উঠতে পারা হয়ত সম্ভব নয়, তবে কীর্তনের কাঠামোগত যে পরিবর্তন নরোত্তম প্রচলন করেছিলেন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। শোনা যায় এই উৎসবে প্রথমে গাওয়া হয়েছিল অনিবদ্ধ সঙ্গীত - শুধু ধ্বনি আর স্বরের বিন্যাসই যার রূপ সৃষ্টি করে, অর্থযুক্ত কথার এখানে কোনও স্থান নেই, না আছে তালের। এই ধ্বনি উদারা-মুদারা-তারা, ক্রমান্বয়ে এই তিন সপ্তককে উদ্‌ঘাটিত করে শ্রোতাদের মাঝে উপস্থিত করে। এরপর নরোত্তম নিজে শুরু করেন নিবদ্ধ বা পদ-তাল-যুক্ত গান, এই গানের শুরুতে গৌরবন্দনারও প্রচলন শুরু করেন নরোত্তম এই খেতরীর মহোৎসবেই ; আজও সব কীর্তনীয়ারাই তাঁদের গান শুরু করেন গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে। পদাবলী বা লীলাকীর্তনের একটি রূপের সন্ধান পাওয়া যায় এরও অনেক আগে, এমনকী চৈতন্য পূর্ববর্তী সময়ে ; জয়দেবের পদ, গানে শুনতে পছন্দ করতেন চৈতন্য নিজেই। চৈতন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রাচীন রাগ ও তালের উল্লেখের কথাও আমাদের জানা, তবুও খেতরীতে নরোত্তম প্রবর্তিত লীলাকীর্তন যে সাঙ্গীতিক চরিত্রের দিক থেকে বিশিষ্ট, এ-কথা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। এখান থেকেই কীর্তন আসরের প্রচলন, দীর্ঘ সময় ধরে একটি আখ্যানকে মেলে ধরবার এই সাঙ্গীতিক রীতি কীর্তনের বৈশিষ্ট্য। নরোত্তম রাধা-কৃষ্ণের লীলা মেলে ধরার প্রক্রিয়াটিকে একটি বিশেষ

কাঠামোয় বাঁধলেন। প্রথমে অনিবদ্ধ অথবা আলাপের মাধ্যমে আসরে স্বর-ধ্বনি-সঙ্গীত জগতের প্রতিষ্ঠা। কালে বিন্যস্ত স্বরসমষ্টির জগতে শ্রোতাদের আহ্বান জানিয়ে শুরু গৌরচন্দ্রিকার নিবদ্ধ সঙ্গীত, তারপর ধীর গম্ভীর বিলম্বিৎ লয়ে লীলাকীর্তনে প্রবেশ। দ্রুত-মধ্য-বিলম্বিৎ লয়-লয়কারি, ছন্দের বৈচিত্র্য ও মিশ্রণ, মূল পদ ও আখর-কাটান, আবৃত্তি-অভিনয়-নাচ পেরিয়ে রাধা-গোবিন্দ মিলন গেয়ে আসরের সমাপ্তি। খেতরীতে সেদিন এই কীর্তনের সঙ্গে বেজেছিল কেবল খোল ও কর্তাল আর এই উপস্থাপনের প্রধান তিনটি অঙ্গ ছিল, নৃত্য গীতবাদ্য ও অভিনয়।

শোনা যায় নরোত্তম বৃন্দাবনে সাঙ্গীতিক তালিম নিয়েছিলেন বৈষ্ণব সাধক হরিদাস স্বামীর কাছে, যে হরিদাসের অন্য প্রধান শিষ্য হলেন আকবরের সভার নবরত্নের এক রত্ন, মিঞা তানসেন। নরোত্তম এই শাস্ত্রীয় ধ্রুপদ সঙ্গীত ও উত্তর ভারতীয় ভজনের নানান অঙ্গ প্রয়োগ করেছিলেন প্রচলিত বাংলা কীর্তনের চলনে ; সমসাময়িক বা রেকর্ডে সংরক্ষিত পুরনো কীর্তন গান শুনলে এমন অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। কীর্তনের নিজস্ব একটি সাঙ্গীতিক রূপ ছিল, তার উদ্দেশ্যও ছিল স্পষ্ট। সেই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভেদও ছিল অনেক। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রধানত সাঙ্গীতিক রূপের চর্চা ; কীর্তন লয়, সুর, তাল, কাব্য, নাচ ও অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে আখ্যান বিন্যাসের লীলা। সুর ও তালের পদ্ধতি নানা দিক থেকে এসে মিশেছিল কীর্তনের নিজস্ব পদ্ধতির অঙ্গে। কীর্তনাঙ্গীয় তালের নামকরণই তার বাঙালি উৎসের চিহ্ন - ললিতপ্যারী, চঞ্চুপুট, গঞ্জন, মদনদোলা, বীরবিক্রম, দশকোশী, দোঠুকি, লোফা, বিষমসমুদ্র ... আরও কত কী।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর - পদাবলী ও লীলাকীর্তনে এই চারটি প্রধান অলঙ্কার। বৃন্দাবনলীলায় ব্রজবাসীরা কেউ দাস্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ নন্দ-যশোদার বাৎসল্য ভাবে, আবার গোপীরা পতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন। কীর্তনীয়ারা তাঁদের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের মনে এই ভাবগুলি জাগিয়ে তোলেন। এদের মধ্যে মধুর, উজ্জ্বল অথবা শৃঙ্গার সর্বশ্রেষ্ঠ। লীলাকীর্তনে চৌষট্টি রস আছে, যেমন শৃঙ্গারের দুটি ভাগ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ চার প্রকার : পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস,

এই চারটি প্রত্যেকে আবার আট ভাগে বিভক্ত। সম্ভোগেরও চারটি বিভাগ : সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, সম্পন্ন সম্ভোগ ও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ, এরা প্রত্যেকে আবার আট ভাগে বিভক্ত ইত্যাদি। বোঝা যায় কীর্তনীয়াদের কত যত্নে আর সতর্কতায় গড়ে তুলতে হয় এই সঙ্গীতের নির্মাণ। এতগুলি রসের মধ্যে পারষ্পরিক সম্পর্ক, পারম্পর্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা নির্ভর করে শিল্পীদের সঙ্গীত এবং তত্ত্বের সূক্ষ্ম, গভীর জ্ঞানের ওপর। রসাভাস অর্থাৎ রসদুষ্টি ভেঙে ফেলতে পারে গোটা কীর্তনের কাঠামো : কীর্তনে রসদুষ্টি কেবলমাত্র অগ্রহণযোগ্য নয়, অশ্রদ্ধেয়ও। শুধুমাত্র একজন দক্ষ গাইয়ের পক্ষে এই কাজ সম্ভব নয়। তাঁকে চর্চা করতে হয় সাহিত্যের, চর্চা করতে হয় তত্ত্বের, তালিম নিতে হয় তাল-সুর-ছন্দ-আবৃত্তি-নৃত্যের। বিরাট এক শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এই সব রসের জোরালো প্রভাব জাগিয়ে তুলতে আসরের মধ্যেই উদ্ভাবন করতে হয় উপস্থাপনার অভিনব কৌশল।

সাধারণত বিলম্বিৎ লয়ে শুরু হয় গান আলাপের ঢঙে। লম্বা তাল - যেমন ছাপ্পান্ন, বত্রিশ অথবা আঠাশ মাত্রার বিভিন্ন মাত্রাসমষ্টিতে বিভাজিত কীর্তনাঙ্গীয় তালের ঠেকা বা লওয়া, গানের সঙ্গে চলে আলাপেরই ভঙ্গীতে। গান বা বাজনা দুটি ক্ষেত্রেই সবসময় মাত্রার নির্দিষ্ট কালিক হিসাবের স্থিতি রক্ষা করা হয় না, যন্ত্র নিয়ে মাত্রা মাপলে অঙ্ক মিলবে না। কখনো কখনো বিলম্বিৎ লয়ের এইসব ভারী তালের কাঠামো থেকে ছেড়ে বেরিয়ে গান চলে যায় আলাপের অনিবদ্ধ ভঙ্গীতে, আবার ফিরে আসে তালের কাঠামোয় ; সঙ্গে খোলও বাজতে থাকে একই আঙ্গিকে। এই অংশের প্রধান উদ্দেশ্য আলাপের চলন রক্ষা করে গানের বিষয়ের মেজাজ প্রতিষ্ঠা করা। এই অংশে লম্বা তালের ওপর বিন্যস্ত হয় নানান ধরনের সুর, মীড় ও গমকের অলঙ্কার। একদিকে যেমন খোলের বাণী, কর্তালের ধ্বনি অন্যদিকে তেমনি এই সুরের বিন্যাস মেলে ধরে কালের প্রেক্ষাপটে বিভাজিত তালের বিশিষ্ট চরিত্রকে। এরপর গল্প যেমন এগোয়, তেমন তার সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে থাকে লয়, ছন্দ আর তাল। কীর্তনের দলে একজন মূল গায়ক, দুই বা ততোধিক দোহার, এক বা দুইজন খোল বাদক, ও একজন কর্তাল বাদক থাকাই রীতি। মূল গায়কের অনুসরণে দোহারেরা ফিরে ফিরে ছোটো একটি পদ গেয়ে

চলেন নির্দিষ্ট ছন্দে আর তার ওপর দিয়ে নিজের মত করে মূল গায়ক গেয়ে চলেন অন্য পদ, অন্য সুরে ; ফিরে ফিরে মিলিত হন দোহারের সঙ্গে। কখনো আখ্যানের অঙ্গ হিসেবে কথোপকথন চলে এদের মধ্যে নাটকের আঙ্গিকে, কখনও বা খোলের ছন্দবৈচিত্র্য গড়ে তোলে কোনও বিশেষ সাঙ্গীতিক মাত্রা - কীর্তনের এই আঙ্গিকটি খুবই উপভোগ্য। সাধারণত মহাজন অর্থাৎ প্রাচীন পদকর্তাদের পদগুলিই গেয়ে থাকেন গায়কেরা, তবে শ্রোতাদের কাছে তাকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে গায়কেরা পদগুলির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিজের ভাষায় ও মনোহারি সুরে উপস্থাপন করেন। দুই কলির একটি পদ বিস্তৃতি পায় বহু পদে ও ছন্দে উন্মিলিত ব্যাখ্যায়। আর এরই সঙ্গে খোলবাদক যথাযথ বাণী ও ছন্দের প্রয়োগে সেই অংশটিকে করে তোলেন মনোগ্রাহী। গানের এই অংশকে বলা হয় আখর আর খোলের অংশকে কাটান। এর মাঝখানে মাঝখানে ঢুকে যায় বিশেষ বিশেষ শিল্পীর নিজস্ব ঢঙে উপস্থাপিত, সুরহীন অথচ নাট্যরসে সিক্ত কথায় গল্প বলা। গায়ক ও বাদকের এই বিরাট স্বাধীনতা ও সৃজনক্রিয়ার পরিসর নিবদ্ধ সঙ্গীতের জগতে বিশেষ দেখা যায় না।

কীর্তনের সঙ্গে যে আনদ্ধ বা চর্মবাদ্যটি বাজানো হয়, দেড় হাত লম্বা পটলের আকারের সেই খোলের শরীর তৈরি হয় পোড়ামাটি দিয়ে, ফাঁপা পোড়ামাটির সেই দেহটিকে মজবুত রাখার জন্য তার ওপর সরু চামড়ার ফিতে জড়ানো হয়। দুপাশের ছাউনি ধরে রাখার জন্য চামড়ার দোয়াল বা ছোট্ ব্যবহার করা হয়। খোলের ডায়না খুব ছোটো আর বাঁয়া তুলনায় অনেকটা বড়ো। এই যন্ত্র কোনও নির্দিষ্ট সুরে বাঁধার ব্যবস্থা নেই ; ডায়নার মুখ ছোটো হওয়ায় এর আওয়াজ খুব তীক্ষ্ণ আর ধারালো এর ধ্বনির সীমারেখা, যে কোনও স্বরগ্রামের সঙ্গেই মানিয়ে যায়। ডায়নার আওয়াজে যেমন কোনও রেশ নেই, ধ্বনিত হয়েই সে থেমে যায়, বাঁয়ার আওয়াজে তেমন রেশ, গাম্ভীর্য, গভীরতা, উচ্চৈঃস্বর ও স্বরবৈচিত্র্যের প্রাচুর্য। এই দুই ধরনের ধ্বনির নিকাশকে ব্যবহার করে, কখনো একক (যেমন ক, খি, তি, না ইত্যাদি) কখনো মিশ্রিত (ঝা, ধৌ, ঘ্রান, গুরগুর ইত্যাদি), কত যে বাণীর সৃষ্টি করেছেন খোলবাদকরা, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। খোলের একক

বাদনও কীর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ; এই অংশে যেমন লয়কারি, ছন্দবৈচিত্র্য ও বাণীর সাঙ্গীতিক প্রয়োগ দেখা যায়, তেমনই একক খোলে পদ বাজানোর রীতিও প্রচলিত যেমন, 'ভা ই ভা ই। শ্রী - চো ই। ত-ন্য নি। তা ই - -' অথবা 'বাজে। দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি তাক। কোথা গেলে প্রাণ নাথ। ধৌ ধৌ ধৌ মুখি। কৃষ ণবা ণী -' ইত্যাদি। ভারতীয় সঙ্গীতে তেহাই একটি আশ্চর্য আবিষ্কার। কীর্তনসঙ্গীতও এর ব্যতিক্রম নয়, গানের থেকে বেশি খোলেই এই অঙ্গটির প্রধান ব্যবহার। গানের ১ ২ ৩ ৪। ১ ২ ৩ ৪। ১ ২ ৩ ৪। ১ ২ ৩ ৪। মাত্রাভাগের ওপর যখন ১ ২ ৩ ৪। **৫** - ১ ২। ৩ ৪ **৫** - । ১ ২ ৩ ৪। **৫** বাজিয়ে সমে এসে খোল মেলে গানের ছন্দে, তখন মনে হয় যেন এক নতুন জগৎ উন্মোচিত হল : তালের প্রথম মাত্রা বা সম নিয়ে আসে এক মুক্তির স্বাদ, শমের বোধ। আর খোলের বাণী যখন পদের শব্দ ব্যবহার করে তেহাই তৈরি করে, সেও নেয় এক অপূর্ব সাঙ্গীতিক রূপ যেমন, ধাঘেরেঘেরেধে নেটাখেটা কৃষণ- কৃষণ- । **ঝা**- -- ধাঘেরেঘেরেধে নেটাখেটা। কৃষণ- কৃষণ- **ঝা**- --। ধাঘেরেঘেরেধে নেটাখেটা কৃষণ- কৃষণ- । **ঝা**। দীর্ঘদিন ধরে উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায়, বহু শ্রম ও আদরে খোল বাদকেরা গড়ে তুলেছেন খোলের এই স্বতন্ত্র বাজ।

কীর্তনের অপর ধাতুনির্মিত ঘন বাদ্যটি হল কর্তাল বা মন্দিরা ; কাঁসার তৈরি এই দুটি ছোটো গোলাকার চাকতি একে অপরের ওপর বিভিন্ন ভাবে আঘাত করে উৎপাদন করে ধ্বনি। এই ধ্বনির রেশ আছে ; তীক্ষ্ণতা আর ঝন্ ঝন্ ঠন্ ঠন্ শব্দে কর্তাল তৈরি করতে পারে এক উন্মদনার জগৎ। খোলা ও চাপা আওয়াজের মিশ্রণে মন্দিরা খোলের চলনকে অনুসরণ করে মিশে যায় গানের শরীরে। একটিকে অন্যটির ওপর এক দিক থেকে অন্যদিকে ঘসে কর্তাল তৈরি করে এক খোলা আওয়াজ, আবার একটিকে অন্যটির ওপর খোলা আঘাত করে সম্পূর্ণ খোলা আওয়াজে এঁরা সৃষ্টি করতে পারেন নানান ছন্দ আর ছন্দবৈচিত্র্য। মন্দিরা বাদকেরাই তালের তালি, খালি ইত্যাদির স্থান তাঁদের বাজনা আর হাতের ভঙ্গিতে বজায় রাখেন। কী নামকীর্তন-নগর কীর্তন, কী লীলাকীর্তন, সব ক্ষেত্রেই খোল ও মন্দিরার ভূমিকা অপরিহার্য।

মোটামুটি খেতরীর সমসময়েই কীর্তনের আরেকটি রূপের প্রচলন শুরু হয় বর্ধমান জেলার মনোহরশাহী পরগনায়, পরগনার নামে এই রীতির নাম মনোহরশাহী। অনেকের মতে এই আঙ্গিকটির স্রষ্টা চৈতন্য পার্ষদ শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, চৈতন্য সমসাময়িক কাঁদরার মঙ্গল ঠাকুর ও মঙ্গল ঠাকুরের শিষ্য রাজুর গ্রামের নৃসিংহবল্লভ মিত্রঠাকুর। খেতরী যেমন নরোত্তমদাসের গ্রাম গোপালপুর সংলগ্ন আরেকটি গ্রাম, মনোহরশাহী কীর্তনের জন্মস্থান শ্রীখণ্ড তেমন শ্রীনিবাস আচার্যের বাড়ি যাজিগ্রাম সংলগ্ন আরেকটি গ্রাম। মনোহরশাহী কীর্তনের সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যের যোগ অনস্বীকার্য। কীর্তন শিল্পীরা মনে করেন গরাণহাটী থেকে মনোহরশাহী রীতির মূল তফাৎ খানিকটা ধ্রুপদের সঙ্গে খেয়ালের মতন। গরাণহাটী কীর্তন প্রধানত পদ-নির্ভর ; বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যই এই গানে গাওয়ার রীতি, আখরের প্রয়োগ সীমিত। একটি পদ একই তালে দীর্ঘ সময় ধরে বিলম্বিৎ লয়ে গাওয়া এই রীতির বৈশিষ্ট্য ; অন্যদিকে মনোহরশাহী রীতির উল্লেখযোগ্য অবদান হল লীলা কীর্তনে একই পালায় বিভিন্ন তাল, লয়, আখরের প্রয়োগ, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদির বিকাশ। গরাণহাটী থেকে বিশিষ্ট হলেও মনোহরশাহী কীর্তনীয়ারা অনেক সময় গরাণহাটী কীর্তনের নানান কঠিন, জটিল ও গম্ভীর সাঙ্গীতিক উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন আজও। ময়নাডালে এই রকম একটি কৌশলের ব্যবহার আজও চলে আসছে - যেমন, একটি গৌরচন্দ্রিকার শেষের জমাট, *নিরুপম গৌর কিশোর রে...* এই পদটি ১৪ মাত্রার মধ্যম দশকোশী তালে চলতে চলতে সেই একই সুরের চলনে ধ্বনির স্থায়িত্বকাল ৪ মাত্রা সঙ্কুচিত করে গাওয়া হয় ১০ মাত্রার আড়, আবার কখনো *'আ- -ম রি- --'* যোগ করে ৪ মাত্রা সম্প্রসারিত করে গাওয়া হয় ১৮ মাত্রার বীরবিক্রম তালে। মনোহরশাহী আঙ্গিকে এই ধরনের সাঙ্গীতিক কৌতুকের ব্যবহার নেই, এটি এঁরা গরানহাটীর চলন থেকেই নিয়েছেন।[৪]

বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড ও কাঁদরায় বহুদিন ধরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চার একটি পরম্পরা ছিল। সেই আঞ্চলিক শাস্ত্রীয় ও লোকসঙ্গীতের ধারার সঙ্গে

[৪] নির্মলেন্দু মিত্রঠাকুর। রেকর্ডেড় কথোপকথন, ময়নাডাল, ২০ অক্টোবর ২০১৭।

অন্যান্য পরম্পরার উপাদান মিশ্রিত হয়ে কীর্তনের এই মনোহরশাহী রূপের সৃষ্টি। লয়, তাল ও সুরের কারুকার্য এবং তার জটিল ও মধুর প্রয়োগ এই সাঙ্গীতিক রূপের স্বাতন্ত্র্য। কাঁদরা সংলগ্ন রাজুর গ্রাম থেকে বীরভূমের ময়নাডালে এসে বিগ্রহ স্থাপন ও মনোহরশাহী কীর্তনের প্রসার শুরু করেন নৃসিংহবল্লভ মিত্রঠাকুর ; আজ বিশিষ্ট এই কীর্তনের রূপের পরিচয় ময়নাডাল মনোহরশাহী নামে। এরই সমসময়ে মল্লভূমের (বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া জেলা) রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন ও মল্লভূমে বৈষ্ণব জীবনযাত্রার প্রচলন করেন। বিষ্ণুপুরের সাঙ্গীতিক ঐশ্বর্যের কথা আমাদের জানা ; বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের উপাদানে ও পরবর্তীকালে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, বিশেষত ধ্রুপদ গান ও পাখোয়াজের চর্চায় বিষ্ণুপুর হয়ে উঠেছিল বাংলার সঙ্গীত চর্চার এক প্রধান ও তাৎপর্যপূর্ণ কেন্দ্র। সুতরাং কীর্তন যে এখানে শ্রীখণ্ড-কাঁদরার থেকে ভিন্ন এক শাখায় বিকশিত হয়েছিল, এমন অনুমান খুব অমূলক নয়।

প্রধান এই দুটি ধারা ছাড়াও বর্ধমান জেলার রানীহাটীতে উদ্ভূত রেনেটি ও মেদিনীপুর জেলার মন্দারনে সৃষ্ট সুর মন্দারিনী নামে পরিচিত। একটা সময় এদের স্বাতন্ত্র্যের স্পষ্টতা নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু আজ সব ধারারই এক ধরনের মিশ্রনের ফলে প্রায় চারশো বছর আগে সৃষ্ট সেই স্বাতন্ত্র্যের রূপ স্পষ্ট করে বুঝতে পারা প্রায় অসম্ভব। বৈষ্ণবধর্ম ও কীর্তন যখন প্রচারিত প্রসারিত হয়ে পৌঁছালো ঝাড়খণ্ডে, কীর্তন সেখানে পেল আরেক সুরের রূপ - ঝাড়খণ্ডী।[৫]

---

[৫] কীর্তন সম্বন্ধীয় এই অংশটি লিখতে নৃসিংহবল্লভের বংশধর ময়নাডালের খোলবাদক সচ্চিদানন্দ ও কীর্তনীয়া নির্মলেন্দু মিত্রঠাকুর এবং কাঁদরার মঙ্গল ঠাকুরের বংশধর গোলকবিহারী ও ঝুলনবিহারী ঠাকুরের সঙ্গে কথোপকথনে উপকৃত হয়েছি। এ-ছাড়া কীর্তন, খোল ও কর্তালের ইতিহাস, আঙ্গিক, চলন ইত্যাদি বুঝতে নিম্নলিখিত বইগুলির সাহায্য নিয়েছি - নরহরি দাস, *শ্রীশ্রীনরোত্তমবিলাস*, তারা লাইব্রেরী, কলকাতা। ১৯২৪, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *কীর্তন*, বিশ্বভারতী, কলিকাতা। ১৯৪৫, বিমানবিহারী মজুমদার, *ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা। ১৯৬১, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা। ২০১১, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস*, সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোস্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা। ১৯৮৯, মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক, কলকাতা। ১৯৯৫।

অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য

অতীত ও ইতিহাসকে ঐতিহ্য বলে ভেস্তে দেবার একটা পরম্পরা মোটের ওপর সব দেশেই লক্ষ করা যায়। অতীত কোনও সংস্কার বা আচারকে যথাযথভাবে বাঁচিয়ে রাখা, সেই সংস্কারের সঙ্গে কাঠামোগত ভাবে যুক্ত এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতার বিন্যাসকে কার্যকর রাখার এক চতুর কৌশল। এই শক্তিশালী জনগোষ্ঠীই অতীত ও অচল কোনও সংস্কার বা মূল্যবোধকে দেশজ ঐতিহ্য বলে প্রতিষ্ঠা করে সমাজে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখতে চায়। নতুন যুগে অপ্রাসঙ্গিক এই অতীত আচার-সংস্কারকে ঐতিহ্য বলে গুলিয়ে দেবার এইটিই রাজনীতি।

ঐতিহ্য কখনো পরিবেশ, সমাজ, দেশ ও কাল নিরপেক্ষ হতে পারেনা ; ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী ঐতিহ্যের বিশিষ্ট রূপ জন্ম নেয়। এই চলমান বৈচিত্র্যই ঐতিহ্যের প্রাণশক্তি, বিশিষ্ট হয়েই ঐতিহ্য জ্যান্ত রাখে তার সৃজনক্রিয়া। বাংলা কীর্তনের রূপবৈচিত্র্য, তার কাঠামোগত বিবর্তন সম্ভব হয়েছে তার ক্রমাগত নতুন হয়ে ওঠায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ যেমন টিকে থাকতে পেরেছে আহ্বান আর প্রেমের দার্শনিক দৃঢ়তায়, বাংলা কীর্তনও তেমন নিজেকে নতুন করে মেলে ধরেছে আহ্বানের সততায়। সঙ্গীত নির্মাণের এই উন্মুক্ত পদ্ধতি বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে সৃষ্ট সাঙ্গীতিক উপাদানকে ধারণ করে নিজেকে নিয়ত করে তুলতে পারে নতুন। এ যে কেবল কীর্তনের ক্ষেত্রেই ঘটেছে এমন নয়, এই প্রক্রিয়া আমরা লক্ষ করে থাকি বাঙালি জীবনের অন্যান্য স্তরেও ; বাংলা পোড়ামাটির মন্দির যার অন্যতম। বাংলার গ্রামে গঞ্জে কীর্তনের মতনই পোড়ামাটির মন্দিরকে ঘিরেও বাঙালি জনজীবন ও শিল্পচর্চা আনন্দময় হয়ে উঠেছে। ঐতিহ্য যেখানে স্বাধীন ভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে সেখানেই গড়ে উঠেছে বাঙালি জনজীবনের বিশিষ্ট নির্মাণ ; সেই বাঙালি মন প্রকাশ পেয়েছে মঙ্গল গানে, পাঁচালিতে, পটে-কথকতায়, পোড়ামাটির মন্দিরের গায়ে শিল্পসৃষ্টিতে, পুঁথির পাটায়, বাউল-ফকির গানে।

কালের স্বরূপ ও সঙ্গীতের নির্মাণ

মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি জন্ম দিয়েছে সঙ্গীতের ; সঙ্গীতের সেই শৃঙ্খলিত রূপের সাধারণ ধর্ম জন্ম দিয়েছে সঙ্গীততত্ত্বের। পৃথিবীর সকল মানবসমাজেই তাদের নিজের মতন করে কোনও না কোনও ভাবে রয়েছে সঙ্গীতের এক ধারণা, সঙ্গীতবোধ, সাঙ্গীতিক রুচি ও এক ধরনের সঙ্গীততত্ত্ব। সঙ্গীতের বিচরণভূমি কাল ; কালের পৃষ্ঠপটেই বিন্যস্ত হয় সঙ্গীত, আঞ্চলিক কাল-বোধ ও কালের ধারণা তৈরি করে বিন্যাস-কৌশলের বিশিষ্ট রূপ। তাই, যে কোনও গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্য শাস্ত্রের প্রধান নির্ভর কালের ব্যাখ্যা, যে কোনও সঙ্গীতস্রষ্টার প্রাথমিক কাজ কালের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

কালের স্বরূপ

কাল এমন একটি বোধ যা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়র ক্রিয়ায় সরাসরি ধরা পড়ে না। অথচ কাল ও দেশের প্রেক্ষিত ছাড়া বস্তুজগতের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানজগতে প্রবেশ অসম্ভব - একটি বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে, একটি ধ্বনি থেকে অন্য ধ্বনিতে, ভাবনা থেকে ভাবনান্তরে পৌঁছনোর প্রক্রিয়া, তার গতিময়তা মানুষের মনে গড়ে তোলে সময়ের বোধ। অন্যদিকে, অনেক দার্শনিক মত অনুযায়ী কাল মানুষের অভিজ্ঞতা প্রসূত কোনও ধারণা নয়। কাল বাইরে কোথাও নেই, আছে মানুষের অন্তরে। দেশ ও কালের বোধ মানুষের চৈতন্যর অংশ, মানুষ এই বোধ নিয়েই জন্মগ্রহণ

করে।[১] জাগতিক কর্মকাণ্ড যে-শৃঙ্খলায় পরিচালিত ও বিরাজিত, তা কি মানুষের চৈতন্যর নির্মাণ নাকি তার চৈতন্যনিরপেক্ষ, বস্তুগত কোনও অস্তিত্ব আছে - দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই নিয়ে অন্বেষণ আজও সক্রিয়। কাল-গতিময়তা-লয়, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নিয়ে যত বিতর্কই থাকুক না কেন, সঙ্গীতের জগতে, গান-বাজনা-নাচ-নাটকের শরীরে কালের ভূমিকা ও তার মাপজোপের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রাচীন ভারতীয় ধারণায় কালকে সৃষ্টি ও বিনাশ, একই সঙ্গে এই দুটি চরিত্রে কল্পনা করা হয়েছে ; কালের একদিকে যেমন রয়েছে তার ঐশ্বরিক শক্তি, অন্যদিকে কালই সত্তাকে করেছে সীমাবদ্ধ। সমস্ত বুৎপত্তিগত অর্থই কালের এই দ্বৈত-ধারণার ইঙ্গিত দেয়। কাল ও দেশের বোধ ছাড়া কোনও কিছুরই অবস্থান বিচার সম্ভব নয়, তাই কাল ও দেশ সর্বদাই একে অপরকে জড়িয়ে থাকে। একে অপরকে জড়িয়ে থাকলেও এদের চরিত্র আলাদা। প্রাচীন ভারতে এদের যে জ্যামিতিক রূপের কল্পনা করা হয়েছে, এই দিক থেকে তা তাৎপর্যপূর্ণ - কালের রূপ বৃত্ত আর দেশের বর্গক্ষেত্র। কালের প্রতীক রথের চাকা, ডমরু, নিজের ল্যাজ নিজে খেতে থাকা সাপ, শঙ্খ ইত্যাদি আর কালের প্রাচীনতম রূপক হল গতিশীল ঘোড়া।[২]

কাল সংক্রান্ত প্রধান যে দুটি ধারণা মানব সমাজে প্রচলিত তার একটি হল সরলরৈখিক বা একমুখী আর অন্যটি চক্রাকার অথবা আবর্তনধর্মী। ভারতবর্ষে কালের ধারণা যে আবর্তনধর্মী তা প্রাচীন গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্য-

---

[১] 'Time is not an empirical concept that has been derived from experience. For neither coexistence nor succession would ever come within our perception, if the representation of time was not presupposed as underlying them *a priori*. ...

'We cannot, in respect of appearances in general, remove time itself, though we can quite well think of time as void of appearences. Time is, therefore, given *a priori*'. Norman Kemp Smith [Translated by], 'Metaphysical Exposition of the Concept of Time', *Immanuel Kant's Critique of Pure Reason*. [1781, 1787], Macmillan, London. 1929. pp. 74-75.

[২] 'Kāla' in Bettina Bäumer [Ed.], *Kalātattvakośa, Volime II, Space and Time-Deśa-Kāla.* IGNCA, New Delhi. 2003. pp. 179-233 দ্রষ্টব্য।

স্থাপত্য-দৃশ্যকলা, প্রাচীন শাস্ত্র ও জীবনধারণের ছন্দ থেকেই স্পষ্ট। কালের চলমান রূপ ও একই সঙ্গে ঘটে চলা তার ভাঙা ভাঙা টুকরোকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে না দেখলেই কালের এই বৃত্তাকার ছন্দ ও চক্রাকার চলন ধরা পড়ে ; টুকরো টুকরো ভাঙা কাল ছুঁয়ে থাকে সদা-চলমান কালকে। কালের দুটি ধারণাই কোনও এক স্তরে সৃষ্টিতত্ত্ব ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত ; কালের পরিমাপ তাই গ্রহ-নক্ষত্রের গতির গণনা ও তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। দীর্ঘদিন ধরে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ নিরীক্ষণ করে নির্মিত হয় কালের একক ও পরিমাপ, তার মাত্রা বিন্যাস। পঞ্চম শতাব্দীর ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দীর্ঘতম সময়সীমার এককের যে হিসেব কষেছিলেন তার নাম কল্প ; চারশো বত্রিশ কোটি (৪৩২০,০০০,০০০) বছর হল এক কল্প। এই হিসাবের পদ্ধতি হয়ত তাঁরা পেয়েছিলেন আরো প্রাচীন পৌরাণিক উৎস থেকে। কিন্তু এত দীর্ঘ কালসীমা মানুষের চিন্তায় ধরা দেয় না, তাই দেখতে পাওয়া যায় চিন্তায় ধরা যায় এমন ছোটো ছোটো সময়খণ্ডে এই কল্প বিভাজিত। সর্পিল, বক্র বা দীর্ঘ আঁকাবাঁকা রেখা যেমন অনেকগুলি ছোটো ছোটো সরলরেখার সমাহার, শঙ্খের অভ্যন্তরীণ গঠনের মত সতত আবর্তিত সময়ও তেমনি ছোটো ছোটো একরৈখিক সময়ের সমাহার। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত তেমন ক্ষুদ্রতম কালের একককে কল্পনা করা হয়েছে বিভিন্ন স্বাভাবিক ঘটনার উপমায় ; চোখের পাতা পড়তে যে সময় লাগে তা এক নিমেষ। দিন-রাত্রির আবর্তন যে সময় নেয় তা অহরাত্র, তেমনি করে পনেরো অহরাত্রয় হয় এক পক্ষ, দুই পক্ষয় এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, বারো মাসে এক বর্ষ ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডের পর্যবেক্ষণে আর্বতনের রূপ বিশিষ্ট কালতত্ত্বের জন্ম দেয় ; সৃষ্ট হয় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, এই দুই প্রান্তের মাঝে মানুষের কল্পনায় ধারণ-যোগ্য যুগের ধারণা। কৃত/সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি - চত্রাকারে ঘুরতে থাকে বারো হাজার বছরে সম্পূর্ণ এই চার যুগ।[৩]

কালের নির্দিষ্ট বোধ ও চলন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলন করে এক বিশেষ

[৩] বিস্তারিত তথ্য ও ভারতীয় কালতত্ত্বের ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য, Romila Thapar, *Time as a Metaphor of History,* Oxford University Press, New Delhi. 1997.

যাপনের ছন্দ। বিশেষ করে সংস্কৃতির প্রকাশে ও বিকাশে এই বোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ; আর বৃহত্তর এই সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যে নাট্য-নৃত্য-গীত-বাদ্য ও সাম্প্রতিক যুগে সিনেমার নির্মাণ-কাঠামোকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে কালের বোধ, তত্ত্ব ও পরিমাপ। ভারতীয় সঙ্গীত - সে মার্গই হোক কি দেশি, শাস্ত্রীয়/দরবারী কি গণ/লোক কি ভক্তি/প্রেম - সব ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষণ নির্ভর, গাণিতিক বিশ্লেষণে সিদ্ধ কালের বিশিষ্ট রূপ ও ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গীত বাদ্য নৃত্য নাট্য ইত্যাদি কাল-নির্ভর শিল্পের চর্চা, অনুশীলন ও সাধনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতে যে কাল-বিভাজন ও সেই অনুযায়ী স্বর-বাণী বিন্যাসের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছিল তাকে বলা হয় তালপদ্ধতি ; গীত, বাদ্য, নৃত্য ও নাট্য জগতে এই পদ্ধতি ভারতবর্ষের মূল্যবান ও বিশিষ্ট অবদান।

ভারতীয় সাঙ্গীতিক চিন্তায় তালের কেন্দ্রীয় ভূমিকা অনস্বীকার্য। চতুর্দশ শতকে লিখিত *সঙ্গীতোপনিষদ সারোদ্ধার* গ্রন্থে সুধাকলস তালের এই ভূমিকা সম্বন্ধে অর্থপূর্ণ যে শ্লোকটি রচনা করেন তার মর্মার্থ হল, ‘তাল ছাড়া গীত বাদ্য অথবা নৃত্যের পূর্ণ নান্দনিক বিকাশ সম্ভব নয়। তাল ছাড়া মেল বা সংহতি নেই আর সংহতি ছাড়া পদ্ধতি নেই। পদ্ধতি-নিরপেক্ষ সঙ্গীত হয় না, সঙ্গীত-নিরপেক্ষ লয়ের অস্তিত্ব নেই, লয় ছাড়া আনন্দ নেই। এই সব কিছুর মূল হল তাল।’[৪]

সঙ্গীতের নির্মাণ

সঙ্গীতসৃষ্টির সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে জড়িয়ে থাকে এক ধরনের নির্মাণ-পদ্ধতি ; ধ্বনি, বিশ্রান্তি, স্বর, বাণী ইত্যাদি সেই নির্মাণ-পদ্ধতির ধর্ম অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়ে জন্ম দেয় সঙ্গীতের। কেমন করে বসবে এক ধ্বনি

---

[৪] গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং তালবর্জ ন শোভতে।
তালাবত্র মেলঃ স্বাদমেলাদব্যবস্থিতিঃ॥

আরেক ধ্বনির পাশে, তাদের ওজন, ঘনত্বই বা কেমন হবে ; শব্দ-নিঃশব্দের সম্পর্ক কী, কোন জাতের শব্দ কতটা নিঃশব্দ ধারণ করতে পারে ; নিঃশব্দের কোনও স্বাধীন সত্তা কি স্বীকৃত হবে সঙ্গীতের কাঠামোয়, নিঃশব্দই কি হতে পারে সাঙ্গীতিক গতির মূল চালিকা শক্তি - সঙ্গীত নির্মাণের অভিজ্ঞতায় এই ধরনের চিন্তার সম্মুখীন হতে হয় সকল সঙ্গীত-স্রষ্টাকে।

তাল : সঙ্গীতকে সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হতেই হয়। এই সংহতি ও শৃঙ্খলা, অন্যান্য যে কোনও শিল্পের মতই সঙ্গীতকে বাঁধে, হয়ে ওঠে তার সীমানা, আবার একই সঙ্গে সেই সীমাই নিয়ে আসে মুক্তি। তাল তেমনই এক পদ্ধতি যা সঙ্গীতকে শৃঙ্খলিত করেই হয়ে ওঠে অফুরন্ত সাঙ্গীতিক উদ্ভাবনের উৎস। কালকে নির্দিষ্ট ক্রমে বিভাজিত করে সঙ্গীতের যে উৎসভূমি তৈরি করা হয় সেই পদ্ধতির নাম তালপদ্ধতি। প্রাচীন কালে সঙ্গীত ছিল প্রধানত কাব্যছন্দ ও অর্থযুক্ত-কথা নির্ভর। ধীরে ধীরে ভারতীয় সঙ্গীত তার নিজস্ব যে রূপ তৈরি করে নিল তা ছন্দ-নির্ভরও নয় কথা-নির্ভরও নয় - যদিও ছন্দ ও কথা, দুটি উপকরণই তার অঙ্গ - সে-সঙ্গীত তাল ও লয় নির্ভর। বিভিন্ন ছন্দের ও মাত্রা-বিন্যাসের সমাহারে তৈরি হয় একেকটি তাল। তালের একক মাত্রা, মাত্রার হিসেবেই বোঝা যায় কোন তাল কত মাত্রার। মাত্রাসমষ্টির বিশেষ বিন্যাস আর বিভাজন গড়ে তোলে একেকটি তালের বিশিষ্ট চরিত্র। তালপদ্ধতি সঙ্গীতকে দেয় একটি কাঠামো আর সেই কাঠামোর ওপর নানান লয় ও ছন্দে বিকশিত হবার মুক্তি ও স্বাধীনতা। কাল সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন চিন্তার সঙ্গে কাল বিভাজনের এই যুক্তি-পরম্পরা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ন রঙ্গমব্যবস্থাতো বিনা রঙ্গ কুতো লয়ঃ।
লয়ং বিনা ন সৌখং স্যাত তন্মূলং তাল উজ্যতে॥
সঙ্গীতোপনিষদ সারোদ্ধার II. 5-6

[*Gita*, *vadya* and *nritya* do not appear in their full beauty without *tala*. Without *tala* there can be no intergration (*mela*), and without integration there can be no method. There can be no music without method, without music there can be no *laya*, without *laya* there can be no delight. The root of all is *tala*. - Tr. M. Bose]

নিচের গানটি তিনতালের কাঠামোয় ছায়ানট রাগের স্বরবিন্যাসে রচিত। ১৬ মাত্রার এই তাল চারটি সমান ভাগে বিভক্ত। তালের প্রথম মাত্রা বা সম থেকে রচনা করা হয়েছে এই গান ; গানের প্রথম শব্দ ও তালের প্রথম তালি, দুটিই একই মাত্রায় অবস্থিত। গানের প্রথম দুটি আবর্তন এই রকম,

১	২	৩	৪	।	৫	৬	৭	৮	।	৯	১০	১১	১২	।	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	।	ধা	ধিন	ধিন	ধা	।	না	তিন	তিন	তা	।	তেটে	ধিন	ধিন	ধা
ঝ	ন	ন	ঝ	।	ন	ন	ঝ	ন	।	ন	ন	ন	ন	।	ন	ন	ন	ন
বা	-	-	জে	।	বি	ছু	য়া	-	।	বা	-	-	-	।	-	-	জে	-

লক্ষ করলে দেখা যাবে তিনতালের ৪+৪+৪+৪ সমপদী কাঠামোর ওপর প্রয়োজন মত এ-গান মাত্রা ভাগ বদলে গড়ে তুলেছে তার নিজস্ব রূপ। গানটির প্রথম লাইনের মাত্রা বিভাগ ভেঙে দেখলে এই রকম দাঁড়াবে, ৩+৩+২(ঝনন ঝনন ঝন)=৮+৪+৪(নননন নননন)=১৬। পরের লাইন ফিরে আসবে তিনতালের মূল ৪+৪+৪+৪ (বা - - জে । বি ছু য়া - । বা - - - । - - জে -)=১৬ মাত্রার মাত্রাসমষ্টি রূপে। এই দ্বিতীয় লাইনে সাতটি মাত্রায় বাণী আর তাদের মধ্যে মধ্যে নয়টি মাত্রায় কোনও কোনও শব্দের গড়িয়ে গেয়ে চলাকে এমন স্বরবিন্যাসে সাজানো যাতে তালের চরিত্র ও চলন অক্ষুণ্ণ রেখে গানের ভাবকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা যায়।[৫]

তালের চরিত্র ও চলন, দুটিই ভারতীয় সঙ্গীতের অপরিহার্য অঙ্গ। তাল ছন্দ নয় ; নির্দিষ্ট ক্রমে সাজানো একাধিক ছন্দের সমাহার। প্রধানত তিন ও চার অথবা দেড় ও দুই মাত্রার আর্বতন ও পদ এবং তাদের নানা রকম মিশ্রণ গড়ে তোলে তালের নির্দিষ্ট চরিত্র। তালের চলন চক্রাকার, একরৈখিক নয়। পূর্বোক্ত গানটি শুনলেই বোঝা যাবে তিনতালের কাঠামো ১৬টি পূর্ণ মাত্রা দিয়ে গঠিত ; প্রথম মাত্রা ফিরে আসে ১৬টি মাত্রার পর। গানের

[৫] এই গানটি নিচের লিঙ্কে ৩:১২ মিনিট থেকে শোনা যাবে, https://www.youtube.com/watch?v=WiUlbkZmIpU

গড়নে ও চলনে এই বারে বারে প্রথম মাত্রা বা সমে ফিরে আসা চক্রাকার গতির নান্দনিক ও সাঙ্গীতিক রূপটি এমন কৌশলে আর সৃজনে রচিত যে শ্রোতাকে এ-গানের কোথায় সম খুঁজে নিতে হয় না। নিবিষ্ট শ্রবণে তিনতালের এই চক্রাকার রূপ শ্রোতার বোধের গভীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নেয়। সম কোনও ভাবেই যে ৪, ৮ বা ১২ মাত্রা পর আসবে না, এই ব্যাকরণগত তথ্যটি জানবার জন্য তখন আর কোনও বিশেষ সাঙ্গীতিক তালিমের প্রয়োজন হয় না। এখানেই রচয়িতা ও শিল্পীর সৃজনীশক্তির সার্থকতা, সঙ্গীতের মুক্তি।

তিনতালের চরিত্রভ্রষ্ট না হয়ে ওই একই কাঠামোর ওপর হতে পারে আরো অনেক ধরনের রচনা। তালের প্রথম মাত্রা বা সম থেকে রচনা শুরু না হয়ে যখন অন্য কোনও মাত্রা থেকে রচনা শুরু হয় তখন তার আরেক রূপ দেখতে পাই আমরা। সাঙ্গীতিক নির্মাণের এ এক অপূর্ব আবিষ্কার। নিম্নোল্লিখিত গানটি তিনতালের ১২ মাত্রা থেকে শুরু - এমন তার সুরের গঠন যে প্রথম ধ্বনিসমষ্টিই তৈরি করে সমে এসে ভিড়বার উৎকণ্ঠা। ১২ মাত্রায় শুরু হয়ে সমে এসে ভেড়ার মধ্যবর্ত্তী সময় খুলে দেয় এক বিশাল জগৎ ; এক পা দু পা করে সেই ধ্বনিপ্রবাহ মিশে যায় এসে সমে। এ-গান শুরু হতে পারত সম থেকেই আর তা হলেও এক আবর্তন সম্পূর্ণ করে সমেই এসে মিলত গানের প্রথম উচ্চারণ, তিনতালের অঙ্কের হিসেবে কোনও ভুল হত না। তা হল না বলেই গানের নির্মাণে তিনতালের চরিত্রের সার্থক ব্যবহার সম্ভব হল আর সঙ্গীত মেলে ধরতে পারলো, সমের আঙ্কিক অবস্থান পার হয়ে, শমের সৌন্দর্য। নট বেহাগ রাগে রচিত এ-গানের[৬] প্রথম আবর্তনের সরলীকৃত মাত্রাবিভাগ ও বাণীলিপি নিম্নরূপ,

১	২	৩	৪	।	৫	৬	৭	৮	।	৯	১০	১১	১২	।	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	।	ধা	ধিন	ধিন	ধা	।	না	তিন	তিন	তা	।	তেটে	ধিন	ধিন	ধা
													ঝন	।	ঝন	ঝন	ঝন	-
পা	-	য়	ল	।	-	-	মো	রি	।	বা	জে	-						

[৬] গোটা গানটি নিচের লিঙ্কে শোনা যাবে, https://www.youtube.com/watch?v=ygZFNxWxlZo

একই তাল সঙ্গীতস্রষ্টার রচনায় প্রকাশিত হতে থাকে বিচিত্র রূপে ; উন্মোচিত হতে থাকে এক বিরাট জগৎ। এই প্রক্রিয়ায় তালের নির্দিষ্ট পদ-ছন্দ-মাত্রা বিভাজনের নক্সার সাঙ্গীতিক সম্ভাবনা আজও উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলেছে ; স্রষ্টার সৃজনশীলতা উন্মোচিত করে চলেছে কালের পটে সঙ্গীতের কাঠামোগত, ভাবগত, নক্সাগত নবতর রূপ। গত শতকে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রসারের যুগে সৃষ্ট বেহাগ রাগের স্বরকাঠামোয় তিনতালে রচিত যন্ত্রের একটি গতের কাঠামো নিম্নরূপ। পূর্বোল্লিখিত গানটিতে যেমন একটি আবর্তনের পরেই ফিরে যাওয়া যায় প্রথম বাণীতে, তার আগের গানটিতে তা সম্ভব নয় ; দুটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে তবেই সে ফিরতে পারে গানের প্রথম বাণীতে। আর এই রচনায় সে ফেরে তিন আবর্তনের পর। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমের বোধ আর হিসাব প্রতিষ্ঠিত ; একটিতে একবার, অন্যটিতে দুই বার ও এইটিতে তিনবার সম আসে গৎ সম্পূর্ণ করতে। এই রচনা দ্রুত লয় তিনতালের তিনটি আবর্তনের ওপর সাজানো। রচনাটির একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হয় ১৬ মাত্রার তিনতালের তিনটি আবর্তন, অর্থাৎ ৪৮ মাত্রা পর। অন্যগুলির মত এ ক্ষেত্রেও গৎটির শুধু কাঠামোর একটা ধারণা দেওয়া হল, গৎটি শুনলে এর সাঙ্গীতিক রূপটি স্পষ্ট হবে।[৭]

১	২	৩	৪	।	৫	৬	৭	৮	।	৯	১০	১১	১২	।	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধিন	ধিন	ধা	।	ধা	ধিন	ধিন	ধা	।	না	তিন	তিন	তা	।	তেটে	ধিন	ধিন	ধা
																ডা	রা	ডা
ডা	-	-	-	।	-	ডা	রা	ডা	।	ডা	-	ডা	-	।	-	-	ডা	রা
ডা	ডারা	ডারা	ডারা	।	ডা-	-রা	--	ডা	।	-	ডা	র্	ডা	।	-	ডা	র্	ডা
-	ডা	র্	ডা	।	ডা	রা	ডিরি	ডিরি	।	ড-	-র্	--	ডা-	।	-	*ডা*	*রা*	*ডা*

তাল কোনও নির্দিষ্ট রূপের নাম নয়, তাল একটি কাল-বিভাজন পদ্ধতি। নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে এই পদ্ধতি তাই জন্ম দিতে পারে নিত্য নতুন তালের।

[৭] আলাউদ্দিন খাঁ রচিত গৎটি নিচের লিঙ্কে ১ ঘন্টা ৩ মিনিট থেকে শোনা যাবে, https://www.youtube.com/watch?v=PdUQ62hDun4

তালের চলন হতেই হয় চক্রাকার, একরৈখিক নয়। একমুখী চলনের ছন্দ থাকতে পারে কিন্তু সে-চলন আবর্তনের ধর্ম অনুযায়ী ধারণ করে না অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ছুঁয়ে থাকা কালের ব্যাপ্তিকে। তাল অর্ধেক পথ এগিয়ে, বাকি অর্ধেক পিছিয়ে সমে ফিরে গড়ে নেয় তার আবর্তনের রূপ। স্বরসমষ্টির বিন্যাসে এই খোলা-মোদার খেলাটা জীবন-মরণ, আলো-আঁধার, পুরুষ-প্রকৃতির একে অপরকে জড়িয়ে সম্পূর্ণ হবার সত্য-সুন্দরকে প্রকাশ করে। সা রে গা মা, ডা-ডিরি অথবা ধা-তা-ধিন-কৎ - যে কোনও বাণীসমষ্টিই হোক না কেন, তাদের সাজানোর সাঙ্গীতিক দক্ষতাই তালের ধর্ম, রূপ আর চলনকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। তালিমের অভাবে সবজান্তার অভিমানে যেখানে তা হয়ে ওঠে না, তাকেই আমরা দুর্বল রচনা বলে চিহ্নিত করি ; ভারতীয় সঙ্গীতের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন দুর্বল রচনারও অভাব নেই।

প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে নানা ধরনের তালের উল্লেখ ও প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। তিনতাল যেমন একটি সমপদী তাল তেমনি প্রাচীন কাল থেকে বিষমপদী তালের ব্যবহারও হয়ে আসছে আমাদের দেশে। তিনতাল চারটি সমপদ নিয়ে গঠিত : ৪+৪+৪+৪=১৬, বিষমপদ তাল দুই বা ততোধিক বিষমপদ নিয়ে গঠিত : ২+২+২+৩=৯, (২+৩)+(২+৩)=১০, অথবা (৩+২+২)+(৩+৪)=১৪ ইত্যাদি। এই রকম একটি তাল ধামারের কাঠামোয় বেহাগ রাগে রচিত একটি রচনার প্রথম লাইন এই রকম,[৮]

১	২	৩	।	৪	৫	।	৬	৭	।	৮	৯	১০	।	১১	১২	১৩	১৪
ক	ধে	টে	।	ধে	টে	।	ধা	-	।	গ	দি	ন	।	দি	ন	তা	-
							আ	-	।	-	জু	-	।	র	-	ঙ্গ	-
খে	-	-	।	ল	-	।	ত	-	।	হো	-	-	।	রি	-	-	-
ব্র	জ	-	।	মে	-	।	-	-	।	ধু	-	-	।	ম	-	ঙ্গ	-
টি	-	-	।	হে	-	।	*আ*										

[৮] শ্রীরামপসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *সঙ্গীত-মঞ্জরী*, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি, কলিকাতা। ১৩১৪ (১৯০৭)।

ধামারের বিষমপদী চলন যেমন এ-গানের বাণী ও স্বরবিন্যাসে প্রতিষ্ঠিত তেমনি লক্ষণীয় ধামারের প্রাণ ও গাম্ভীর্য, ৭ ও ১৪ মাত্রায় যতি বা নিঃশব্দকে গান বাঁধার মধ্যে কী দক্ষতায় ও সৃজনীশক্তিতে রক্ষা করা হল। ব্যাকরণ রক্ষা করে, অঙ্ক কষে, কর গুনে যে গান বাঁধা যায় না, এ-গান তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। একই তালে আরো অনেক গান ও গৎ বাঁধার উদাহরণ আছে ; প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বরবিন্যাসের বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন মাত্রা থেকে বন্দিশ বা গৎ শুরুর মধ্য দিয়ে ঘটে চলেছে ধামারের ভিতরে লুকিয়ে থাকা নানান রূপের উদ্‌ঘাটন।

তাল পদ্ধতি এমন একটি সঙ্গীত নির্মাণ প্রক্রিয়া যে তা জন্ম দিতে পারে একের পর এক তালের আকারকে, তালের রাজ্য তাই বিপুল বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তিনতাল ৪টি সমপদে বিভাজিত ১৬ মাত্রা বিশিষ্ট একটি তাল, এই একই মাত্রা সমষ্টি ও পদ বিভাজন রক্ষা করে গঠিত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের ও রঙের আরো কয়েকটি তাল। যেমন আদ্ধা : ৪টি পদের প্রতিটি পদ তিনতালের ১ ২ ৩ ৪ ছন্দের বদলে সাজানো হয়েছে $১^{১}/_{২}+১^{১}/_{২}+১=৪$, দুগুনে গুনলে ৩+৩+২=৮, এই ক্রমে। ধা- -ধিন -- ধা- । ধা- -ধিন -- ধা- । না- -তিন -- না-। তা- -ধিন -- ধা-, এই হল আদ্ধার তবলা ঠেকা আর তার চলন ও রূপ। তিনতালের মত সমান পদক্ষেপে চলে না এ-তাল, চপল হাস্যোচ্ছল এই তাল চলে লাফিয়ে লাফিয়ে - এই তালে তাই রচিত হতে পারে সেই মেজাজেরই কোনও গান বা গৎ। ঠেকার বাণীর মধ্য দিয়ে যে রূপ প্রকাশিত, সেই মেজাজই ফুটে ওঠে গানের বা গতের স্বর ও বাণী সাজানোর কৌশলে। আবার আরেক ভাবে সেজে এই চারটি সমপদে বিভক্ত ১৬ মাত্রার তালই পেয়ে যায় মধ্যমানের রূপ : $১^{১}/_{২} + ১+ ১^{১}/_{২}=$ ৪, দুগুনে ৩+২+৩=৮। ধা- -ধিন -ধা ধিন-। ধা- -ধিন -ধা ধিন- । না- -তিন -তা তিন- । তা- -ধিন -ধা ধিন- । এই যুক্তি পরম্পরায় গড়ে ওঠে ১৬ মাত্রার আরো অনেক তাল - তিলুয়াড়া, যৎ, আড়াঠেকা ইত্যাদি।

পৃ. ৫২২-৫২৩ দ্রষ্টব্য। গানটির বাংলা রূপ শোনা যাবে নিচের লিঙ্কে, https://www.youtube.com/watch?v=3SsQuDg4m60

১৪ মাত্রার তালের একটি রূপ ধামার, ১৪ মাত্রার অন্য চরিত্রের আরো অনেক তাল আছে যেমন, আড়াচৌতাল, দীপচণ্ডী, ঝুমরা ইত্যাদি। একই প্রক্রিয়ায় গঠিত ১২ মাত্রার চৌতাল, একতাল, খেমটা, ১০ মাত্রার সুরফাঁকতাল, ঝাপতাল ইত্যাদি।

একদিকে দেখা যাবে একই তালে রচিত বিভিন্ন রচনা যেখানে একই তালের ভিন্ন ভিন্ন রূপ উন্মোচিত অন্যদিকে দেখব একই মাত্রা বিশিষ্ট কাঠামোর ভাঙা-গড়ার পরিণতিতে পেয়ে যাওয়া তালের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র, রঙ আর মেজাজ ; সাঙ্গীতিক রূপ উদ্‌ঘাটনের খেলার এ এক সুখকর চর্চা। এর মানে অবশ্য এই নয় যে মাত্রা ও পদের যে কোনও রকম ওলট-পালট, ভাঙা-গড়া, বিস্তার-প্রস্তারই দিতে পারে নূতন তালের জন্ম। নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ না করে শুধু ছন্দের মিশ্রণ ও কিছু বাহারি পদ ব্যবহার করলেই তালের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় না। গীত, বাদ্য তো কেবল ঠেকা, বন্দিশ ও গতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; তারা চলতে থাকে সঙ্গীতের নানান উপকরণ উপাদান ও অলঙ্করণকে নিয়ে। স্বরবিস্তার, তান, পেশকার, কায়দা, কৃন্তন, জমজমা যাই হোক না কেন সবাইকেই বিন্যস্ত হতে হয় কালের এই বিভাজন ক্রিয়ায় উদ্ভূত তালের কাঠামোর ওপর। কালকে ভালোবেসে বিশ্লেষণ করে ভেঙে ভেঙে তালপদ্ধতির বৈচিত্র্যময় যে সঙ্গীতজগৎ তৈরি করেছে ভারতবর্ষ, তেমন সঙ্গীতজগৎ বা তালের ধারণা ও পদ্ধতি ভারতবর্ষের বাইরে বিশেষ দেখা যায় না।

লয় : তিনতাল ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে সর্বাধিক প্রচলিত ও ব্যবহৃত একটি তাল। এর একটি প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে অতিবিলম্বিৎ-বিলম্বিৎ-মধ্য-দ্রত-অতিদ্রুত, সবকটি লয়েই তিনতাল তার বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র বজায় রাখতে পারে। চারচৌকো সমপদী তাল হওয়ায় তার ওপর প্রায় সবরকম মাত্রাবিশিষ্ট ছন্দ ও পদ নিয়ে খেলা করার সম্ভাবনা অনেক প্রসারিত। একই কারণে সমান লয় কাঠামোর ওপর বিভিন্ন লয়ের নাচানাচি খোলে ভালো - স্রষ্টা ও শ্রোতারা একই ছন্দ ও পদের পৌনঃপুনিক আবৃত্তির একঘেঁয়েমি থেকে রক্ষা পান। দাদরা (৩+৩=৬), কাহারবাও (৪+৪=৮) সমপদী তাল অথচ

এদের মাত্রার বিস্তার সীমিত বলে সব লয়েই এরা তাদের চরিত্র বজায় রাখতে পারে না। একতালের লয়ের পরিধি দাদরার তুলনায় অনেক বেশি। চারটি সমপদে গঠিত ১২ মাত্রার (৩+৩+৩+৩=১২) এই তালের ৪৮ মাত্রার (প্রতিটি মাত্রাকে ৪ মাত্রা ধরে হিসেব কষে ১২×৪=৪৮) একটি অতিবিলম্বিৎ রূপ তুলনায় সাম্প্রতিক কালে কণ্ঠসঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত। ধামার অথবা ঝুমরা দ্রুত লয়ে তাদের ওজন হারায়, অথচ একই পদ বিভাজনে মধ্য ও দ্রুত লয়ের উপযুক্ত তাল পায় তুলনায় হাল্কা দীপচণ্ডীর রূপ ও চলন : ধা ধিন - । ধা ধা । তিন -। না তিন - । ধা ধা । ধিন - । ৪-টি ৪ মাত্রা বিশিষ্ট সমপদের ১৬ মাত্রায় বিছিয়ে থাকা, বর্গক্ষেত্ররূপী তিনতালের কাঠামো দম নেবার অনেক বেশি পরিসর দেয় বলে সব লয়েই স্বচ্ছন্দ থাকার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

যে কোনও সঙ্গীতে লয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। লয় বলতে আমরা সাধারণত গতি বুঝি - বিলম্বিৎ থেকে মধ্য হয়ে দ্রুত অবধি যার বিস্তার। পরবর্তীকালে লয়ের ধারণা ও প্রয়োগ বিস্তৃত হয়েছে অতিবিলম্বিৎ অথবা মধ্য বিলম্বিৎ, বিলম্বিৎ মধ্য, অতি দ্রুত ইত্যাদি লয়ের জগতে ; সঙ্গীতের ভূবন এই ভাবেই তার পরিধি চলেছে বাড়িয়ে, হয়ে উঠছে নবতর উপকরণে সমৃদ্ধ। অন্যদিকে দেখা যাবে যে লয় বলতে কেবল একই বাণীসমষ্টিকে ধীর বা দ্রুত উচ্চারণ করাকেই বোঝায় না। কোনও গৎ, বাণী বা বন্দিশের মাত্রা বিভাগ, তালের কাঠামো ও চলন একই রেখে শুধু তার গতিকে কমিয়ে বা বাড়িয়ে গাওয়া বা বাজানোকে যেমন লয় বাড়া-কমা হিসেবে দেখা হয়, তেমনি একটি লয়ের ওপর আরেক লয় ও ছন্দের গড়িয়ে চলাকেও লয়েরই রূপ হিসেবে, সঙ্গীতের ভাষায় লয়কারি হিসেবে দেখা হয়। ধরা যাক একটি ৪ মাত্রার পদের কথা, এই চারটি মাত্রা উচ্চারিত হতে যে সময় লাগে সেই একই সময় নিয়ে যদি তার ওপর ৩ মাত্রা বসানো যায় তাহলে তার ছন্দের পরিবর্তন ঘটে, তিনের পরিবর্তে সেখানে পাঁচ, সাড়ে পাঁচ, সাত কি নয়ও বসানো যায় ; নিচে পড়ে থাকা ৪/৪ ছন্দ তখন খেতে থাকে এক দুলুনি, সে-দুলুনি সবসময় সুখকর না হলেও হয় সুন্দর আর সাঙ্গীতিক। তবলার একটি ৮ মাত্রার রচনা নিম্নরূপ। প্রতিটি মাত্রায়

এখানে বাণীর ঘনত্ব বাড়তে থাকে নির্দিষ্ট ক্রমে : দেড়-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়-সাত-আট। প্রথম মাত্রায় দেড়, অন্যগুলিতে মাত্রা সংখ্যা ও বাণী সংখ্যা একই। তিনতালের নবম মাত্রা বা খালি থেকে শুরু করে এই রচনা মিশতে পারে সমে এসে।

১	২	৩	৪
ধা-তি	ধা-তি-	ধাধাতি	ধাতিধাতি
৫	৬	৭	৮
ধিনাধিধিনা	ধাধিনানাতুনা	ধাতেটেধেটেতেটে	ধাগেতেটেতাগেতেটে

আবার আরেক রকম ভাবেও সাজানো যায় বাণী, যেমন ৪ মাত্রায় বিন্যস্ত 'ধা ধিন ধিন ধা'-কে দেড়গুনে বাজালে ১২ মাত্রা বিন্যস্ত হয় ৮ মাত্রার ওপর (৪ মাত্রার ওপর [$৪×১^{১}/_{২}$]=৬ মাত্রা) অথচ ৪ মাত্রার পদ-সংগঠন বজায় থাকে আর তিনগুনে বাজালে একই পদ ৩ বার বেজে ৪ মাত্রার ওপর এই ১২ মাত্রার বিন্যাস পাওয়া যায়। নিচের বাণীলিপিটি প্রথম ৪ মাত্রায় ৪টি, পরের ৮ মাত্রায় ১২টি (দেড়গুন) ও শেষ ৪মাত্রায় ১২টি বাণী (তিনগুন) দিয়ে তিনতালের সংগঠনে সাজানো।

১	২	৩	৪
ধা	ধিন	ধিন	ধা
৫	৬	৭	৮
ধা - ধিন	- ধিন -	ধা - ধা	- ধিন -
৯	১০	১১	১২
ধিন - ধা	- ধা -	ধিন - ধিন	- ধা -
১৩	১৪	১৫	১৬
ধা ধিন ধিন	ধা ধা ধিন	ধিন ধা ধা	ধিন ধিন ধা

৪ মাত্রার পদের গড়ন বজায় রেখে এইটি যখন বাজানো হয়, তখন তার ঝোঁক পড়ে পদের প্রথম মাত্রা ধা-এ ; দেড়গুনে ৫ মাত্রার প্রথমে, ৭-এর

শেষে ও ১০-এর মাঝখানে পড়ে এই ঝোঁক, ৬,৮,৯,১১,১২ মাত্রায় কোনও ঝোঁক পড়ে না। শেষ ৪ মাত্রায় তিনগুনের প্রথম ধা ১৩ মাত্রার প্রথমে, দ্বিতীয় ধা একটু সরে ১৪ মাত্রার মাঝখানে, তৃতীয় ধা আরো সরে ১৫ মাত্রার শেষে আর ১৬ মাত্রায় কোনো ঝোঁক পড়েনা। এই কাল-সংগঠন সঙ্গীতে আনে অন্য এক গতি, শ্রোতার মনে জাগায় নতুন উদ্দীপনা। সঙ্গীতের নির্মাণ প্রক্রিয়া এই ভাবেই সাঙ্গীতিক রূপ নির্মাণের ফুর্তিতে নিজেকে সজীব রাখে।[৯]

আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে তিনটি লয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় : বিলম্বিৎ, মধ্য, দ্রুত।[১০] আজকের যুগের সঙ্গীতচর্চায় এবং শ্রুতিবাহিত সঙ্গীতশিক্ষায় সাধারণভাবে বিচার করলে বিলম্বিতের দুগুন হয় মধ্য ও মধ্যর দুগুন দ্রুত ; প্রাচীন কালে হিসেবটা হত এর ঠিক উল্টো পথে, অর্থাৎ দ্রুতের দুগুন মধ্য, মধ্যর দুগুন বিলম্বিৎ। সমকালে উচ্চারিত ধ্বনির ঘনত্ব বাড়া-কমাকেই আমরা লয় বলে জানি আজকের যুগে। প্রাচীন যুগে দুটি ধ্বনি অথবা ক্রিয়ার মধ্যবর্তী বিশ্রান্তিকে বলা হত লয়। ক্রিয়া বা শব্দর দুগুন আর বিশ্রান্তি বা নৈঃশব্দের দুগুন তাই তৈরি করে দুটি ভিন্ন অঙ্ক, ভিন্ন চিন্তা-কাঠামো ; সঙ্গীত নির্মাণে এদের প্রভাব পড়া অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় সঙ্গীতচর্চার দীর্ঘ ইতিহাসে এই দুটিকে অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা যায় না ; এই ক্রিয়া ও বিশ্রান্তির মিলিত বোধ ভারতীয় সঙ্গীতের শরীরের মূল উৎস, সঙ্গীত নির্মাণের চালিকা শক্তি। ক্রিয়া আর বিশ্রান্তিকে মিলিত রূপে দেখলে যে কোনও ক্রিয়া বা শব্দ সবসময়েই ধারণ করে থাকে বিশ্রান্তি বা নৈঃশব্দকে ; নৈঃশব্দের নির্মাণই তখন হয়ে ওঠে সৃষ্টিশীলতার প্রধান কাজ।

---

[৯] তাল ও তার বিস্তার-প্রস্তার সংক্রান্ত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Akella Mallikarjuna Sharma, *Talaprastara of Sharngadeva's Sangita Ratnakara* (A Critical Interpretation), Sai Sannidhi Sangita Publications, Hydrabad, 2001.

[১০] Chapter Thirty-One, 'Time Measure', *The Nāṭya Śāstra,* Vol. II, Ascribed to Bharata-muni. Translated by Manomohan Ghosh. Asiatic Society, Calcutta, 1961 দ্রষ্টব্য।

কাল ও লয়ের সম্পর্ক আলোচনায় লয়ের আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন নন্দনতাত্ত্বিক অভিনবগুপ্ত। *নাট্যশাস্ত্র*-র ব্যাখ্যায়, একাদশ শতাব্দীর এই কাশ্মিরী নন্দনতাত্ত্বিক কাল ও লয়, এই দুটি কালিক উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন প্রাকৃত ও বিকৃত হিসেবে। প্রাকৃত অর্থে প্রকৃতি অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত কর্মকাণ্ডের ও লয়ের কারণ ; বিকৃত অর্থাৎ কার্যকারণহীন সৃজন[১১]। সৃজনই আনে পরিবর্তন আর পরিবর্তনই, অনেকের মতে বিবর্তন।

তেহাই : (রাই টানে) *নয়নে, নয়নে, নয়নে* (গো) ...স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, ভালো-খারাপ-মোটামুটি, ছোটো-বড়ো-মাঝারি ; সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, বিলম্বিৎ-মধ্য-দ্রুত... (রাই টানে) *নয়নে, নয়নে, নয়নে* (গো) ...। ৩-এর টান নয়নের টানকে ছাপিয়ে আমাদের যাপনে-চিন্তায়-অভিজ্ঞতায়-ক্রিয়ায় এমন এক জায়গা করে নিয়েছে যে জীবনের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত এর উপস্থিতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে আমরা সচেতন নই। যেমনি স্বাভাবিক জীবনে এর উপস্থিতি, তেমনি স্বাভাবিক এর সাঙ্গীতিক প্রয়োগ। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র, সব সম্প্রদায়ের সব রকম সঙ্গীতে ও নৃত্যে এর প্রয়োগ দেখা যায়। ছন্দোবদ্ধ একটি পদসমষ্টি পর পর তিনবার বাজানোর এই রীতি আমাদের অগোচরেই স্থান করে নেয় আমাদের সঙ্গীতে। সঙ্গীত নির্মাণের এই কৌশলের সাঙ্গীতিক নাম তেহাই ; গান, বাজনা বা নাচে এর কোনও স্বাধীন ভূমিকা নেই, তেহাইয়ের অবস্থান একটি তান, বিস্তার বা রচনার শেষ অংশে। তেহাই-ই রচনার শেষ ও পরের আবর্তনের শুরুকে সূচিত করে ; তেহাইয়ের শেষ মাত্রা এসে মেশে তাল বা রচনার প্রথম মাত্রায়।

---

[১১] ‘*Kāla* is known as *prākṛta* i.e. as pertaining to nature or being the cause (The pruport seems to be that kāla or the standard unit of time is peceived even in life in general termed as *prakṛti* or nature and that is the cause of *laya*). ...*Lay* is of the nature of *vikṛita* (created or effect, as opposed to natural or causal),...’ Abhinavagupta, *Abhinavabharati*. Quoted in ‘Laya’ in Bettina Bäumer[Ed.], *Kalātattvakośa*, *Volume II, Space and Time - Deśa-Kāla*. IGNCA, New Delhi. 2003. p. 392.

তেহাইয়ের বাঁধুনি যেমন হতে পারে সরল, সহজ তেমনি হতে পারে অত্যন্ত জটিল। হতে পারে কম মাত্রা বিশিষ্ট আবার অনেক মাত্রা বিশিষ্ট ; হতে পারে একটি লয়ে বাঁধা আবার একই রচনার মধ্যে ঘটতে পারে বিভিন্ন লয়ের সমাবেশ। সঙ্গীতজ্ঞ ও তাত্ত্বিকরা তেহাইয়ের গঠনরীতি অনুযায়ী তাদের শ্রেণীবদ্ধ করেছেন নানান ভাবে। তারই দু'একটি নমুনা নিচে উল্লিখিত হল,

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

তেটে কতা গদি ঘেনে ধা -, তেটে কতা গদি ঘেনে ধা -, তেটে কতা গদি ঘেনে

ধা

তিনতালের কাঠামোয় রচিত এটি একটি প্রচলিত সহজ তেহাই, এর একেকটি বাণীসমষ্টি বা পদ, যাকে সঙ্গীতের ভাষায় বলা হয় পাল্লা, হল 'তেটে কতা গদি ঘেনে ধা'। এদের মাঝখানে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় পাল্লার পর বাণীহীন এক মাত্রার একটি দম নেবার ব্যবস্থা আছে, তাই এই ধরনের তেহাইকে বলা হয় দমদার তেহাই। মাঝখানের এই বাণীহীন মাত্রাটিকে যদি বাদ দিয়ে দিই, তাহলে এর তিনটি পাল্লা সম্পূর্ণ করতে লাগবে ১৪ মাত্রা ; ১৪ মাত্রার তালে এই রাস্তা ব্যবহার করা হয়ে থাকে, আবার একে দুগুনে বাজালে সে তিন পাল্লা সম্পূর্ণ করবে ৭ মাত্রার তালের আবর্তনে। এই ধরনের তেহাই কাঠামোর নাম বেদম তেহাই,

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

তেটে কতা গদি ঘেনে ধা তেটে কতা গদি ঘেনে ধা তেটে কতা গদি ঘেনে

ধা

আবার, তিনটি পাল্লা একদম এক রকম না হয়ে মাত্রা সংখ্যার সামান্য বদল ঘটিয়ে তৈরি করে নেওয়া যায় আরেক জাতের তেহাই যেমন,

১	২	৩	৪
ধাধিনা নাথুনা	ধাধিনা নাথুনা	ধাধিনা নাথুনা	ধা-- --তা
৫	৬	৭	৮
ধা-- ধাধিনা	নাথুনা ধাধিনা	নাথুনা ধাধিনা	নাথুনা ধা--
৯	১০	১১	১২
--তা ধা--	--তা ধা--	ধাধিনা নাথুনা	ধাধিনা নাথুনা
১৩	১৪	১৫	১৬
ধাধিনা নাথুনা	ধা-- --তা	ধা-- --তা	ধা-- --তা
১			
ধা			

একটি নির্দিষ্ট সময়কালে কিছু স্বর, ধ্বনি ও বাণী নিয়ে এলোমেলো লাফালাফি করলেই সঙ্গীত সৃষ্টি হয় না। সঙ্গীতের ভিতরে লুকিয়ে থাকে এক নির্মাণ পদ্ধতি ; সে-পদ্ধতি সরল, অতি সরল হতে পারে আবার জটিলও হতে পারে। আমাদের দেশে এমন কৌশল আবিষ্কারের প্রক্রিয়া চলে আসছে বহুদিন ধরে। সেই প্রক্রিয়ায় আজও জন্ম নিয়ে চলেছে বৈচিত্র্যময় অফুরন্ত সাঙ্গীতিক রূপ।

নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া গান-গৎ-ঠেকা বাঁধা যায় না, এ-কথা ঠিক তবে এ-কথাও মনে রাখা জরুরি যে কেবল মাত্র পদ্ধতি দিয়ে সঙ্গীত সৃষ্টি সম্ভব নয়। সাঙ্গীতিক পদ্ধতি, উপাদান ও উপকরণ যখন মানুষের চেতনার, হাত-গলা-শরীর-চিন্তার অবিচ্ছেদ্দ অঙ্গ হয়ে ওঠে তখনই সঙ্গীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায়, উপস্থাপনা হয় অনায়াস। তাত্ত্বিক, পুঁথি মুখস্থ করা এমন কিছু সঙ্গীতরচয়িতার খবর ইতিহাস খুঁজলে হয়ত পাওয়া যাবে, তত্ত্ব জাহির করা ও অঙ্কর জটিল হিসাব দেখানোই যাঁদের কাজ। তত্ত্ব, পদ্ধতি, ব্যাকরণের সঙ্গীতে রূপান্তরের সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়াটিকে এঁরা ছুঁতে পারেন না। সমস্ত সৃজন-ক্রিয়ার বাইরে এঁরা গড়ে তোলেন এক ব্যাকরণ-শাসিত, শাস্ত্র-সর্বস্ব, নিশ্চল সাঙ্গীতিক মৌলবাদ। এমন যন্ত্র ও যন্ত্রণায় আবদ্ধ সাঙ্গীতিক পরিবেশ, সৃজনশীল সঙ্গীতস্রষ্টাদের বাধ্য করে প্রাণের সন্ধানে অন্যত্র বেরিয়ে পড়তে

- অতীতে এর বহু নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। সাঙ্গীতিক প্রেরণা পাবার কিছু উৎস হয়ত আজকের মানুষ এখনও আমাদের দেশেরই কোনও কোনও জনপদে, জীবনযাপনে, উৎসবে, সঙ্গীত-নির্মাণ পরম্পরায় খুঁজে পেতে পারেন ; সেখান থেকেই শুরু হতে পারে নতুন কোনও সঙ্গীতের যাত্রা।

সঙ্গীতের ভাঙন, ভাঙনের সঙ্গীত

মানুষের মনে ও সমাজে সঙ্গীতের গভীর আবেদন ও প্রভাব পৃথিবীর সব জনসমাজেই অনুভূত এবং স্বীকৃত। সঙ্গীতের এই জাদুকরি প্রভাব, আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে বহু গবেষণার। অন্যান্য জ্ঞানচর্চার মতই এই চর্চাও ভেদ করতে চেয়েছে এর রহস্য, সাঙ্গীতিক শক্তির সেই উৎসকে প্রয়োগ করতে চেয়েছে জীবন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে। একদিকে যেমন সঙ্গীতস্রষ্টারা এই শক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রক্রিয়ায় সঙ্গীতকে করে তুলছেন বৈচিত্র্যময়, অন্যদিকে প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, চিকিৎসাবিদ্যা ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সঙ্গীতের উপযোগিতা আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীরা খুলে দিচ্ছেন সঙ্গীত প্রয়োগের অনেক নতুন পথ। আর আজকের যুগে, মনস্তত্ত্ব ও মস্তিষ্কবিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-গঠনে মস্তিস্কের ভূমিকা ও মানব মস্তিস্কে সঙ্গীতের প্রভাব নিয়ে অনুসন্ধানও হয়েছে তুলনায় অনেক সহজ।

ভাষার মতন সঙ্গীতেরও কি কোনও অভ্যন্তরীণ কাঠামো মানুষের মস্তিস্কের গঠনে জড়িয়ে আছে? ভাষা, গণিত ও সঙ্গীতের আচরণ কি একই উৎস থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়? দৃশ্যশিল্প, সঙ্গীত থেকে কি এই মূল কাঠামোগত কারণেই পৃথক নয়? ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে গবেষণায় রত আজকের যুগের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা।[১] এই সূত্রে এও লক্ষণীয় যে মনোবিজ্ঞান ও

---

[১] 'It seems that whenever there is an urge to talk about languagelike systems, people typically mention music, arithmatic, and logic, among others. (p. 189) ...it seems that music, like human language, is a completely universal, species-specific capacity. (p. 191) ...it is plausible to assume that musical systems satisfy some

মস্তিস্কবিজ্ঞানের এই ধরনের গবেষণার শুরু ও বিস্তার যেহেতু প্রধানত অ্যামেরিকান-ইয়োরোপিয় শিক্ষা জগতেই হয়েছে, সেহেতু তাঁদের কাজের ভিত্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে ইয়োরোপিয় সঙ্গীত-নির্ভর। সম্প্রতি এই ধরনের গবেষণায় যুক্ত হয়েছেন অনেকে যাঁরা ভারতীয়, আফ্রিকান এবং অন্যান্য অনেক ধরনের অ-ইয়োরোপিয় সঙ্গীতে এই ধরনের ইয়োরোপিয় সঙ্গীত-নির্ভর তত্ত্ব প্রয়োগের অযৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন - সঙ্গীত বিশ্লেষণের জগৎ এভাবেই ক্রমশ হয়ে উঠছে তাৎপর্যপূর্ণ।[২] মানব সঙ্গীতের উৎস, মানব মনে ও মস্তিস্কের কোন অঞ্চল তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে চলে বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ। বিজ্ঞানীরা মনে করেন বৈজ্ঞানিক সন্ধানের পথে আবিষ্কৃত সত্য, সঙ্গীত নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে।[৩]

মানব সমাজ বা কৌম গঠনে ভাষার মতই সঙ্গীতও এক প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। সংযোগ ও সঞ্চার, মানব সমাজকাঠামোর এই দুটি প্রধান স্তম্ভই জোরালো হয়েছে, গতি পেয়েছে সঙ্গীতের চর্চায়। জন্ম থেকেই সঙ্গীত সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত যদিও আজকের যুগে সমাজে সঙ্গীতের

---

of the well-known general properties of language such as unboundedness and weak external control. (p. 193) ...it is most likely that the linguistic and visual systems access different computational systems; it is hard to find a dimension in which to place the visual system on a par with the linguistic system. The music system, in contrast, seems to satisfy all those "languagelike" conditions that the visiual system fails to satisfy. (p. 197)' Nirmalangshu Mukherji, 'Language and Music', *The Primacy of Grammar,* The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England. 2010, Douglas R. Hofstadter, *Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid,* Penguin. 1979 দ্রষ্টব্য।

[২] Bijoy Mukherjee, 'Cognitive Theory: The Case of Indian Music', Unpublished paper presented in Hydrabad University, 2004, Martin Clayton, *Time in Indian Music: Rhythm, Metre, and Form in Indian Raga Performance*, OUP, New York 2008 দ্রষ্টব্য।

[৩] John Sloboda, *Exploring the Musical Mind: Cognition, Emotion, Ability, Function,* OUP. 2005, A.C. Lehmann, J.A. Sloboda, R.H. Woody, *Psychology for Musicians,* OUP, 2007 দ্রষ্টব্য।

ভূমিকা বদলে গেছে অনেকটাই। সমাজবিজ্ঞানীরা সঙ্গীতের এই ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। যুগপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতার পারষ্পরিক সম্পর্ক মানুষ কীভাবে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছে, সেই বিশ্লেষণ হয়ে উঠেছে এই সমাজবিজ্ঞানীদের প্রধান মনোযোগের বিষয়। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন সঙ্গীতের রয়েছে এক সমাজজীবন, সঙ্গীতস্রষ্টারা সঙ্গীতের এই সামাজিক তাৎপর্য অথবা সামাজিক অভিব্যক্তির দিকটি অবহেলা করেন। ফলে কোন নিঃশব্দ মুহূর্তে সঙ্গীতের উৎপাদন রূপান্তরিত হয়ে যায় টেক্নলজির কনজামশনে, শ্রবণ রূপান্তরিত হয় পারফরমেন্সে, সে সম্বন্ধে এঁরা সচেতন থাকেন না। সঙ্গীততাত্ত্বিকরা, মনোবিজ্ঞান-মস্তিস্কবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান, এই দুটি জ্ঞানচর্চার জগৎকেই সঙ্গী করে নেন তাঁদের মূল সঙ্গীততত্ত্বানুসন্ধানের।[৮]

বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও সাঙ্গীতিক - উপরোক্ত এই তিনটি জ্ঞানজগতের গুরুত্বই সমাজে স্বীকৃত অথচ সব ক্ষেত্রে এরা সঙ্গীতস্রষ্টার সৃষ্টিলীলায় মিলিত হতে পারেনা। সঙ্গীতস্রষ্টারা মনে করেন সঙ্গীতের রয়েছে এক নিজস্ব শরীর ; তার কাঠামো ও ধ্বনিবিন্যাসের কৌশল সম্বন্ধে অবগত না থাকলে কোনও অর্থপূর্ণ সঙ্গীতালোচনা সম্ভব নয়। এভাবেই জারি থাকে স্রষ্টা ও সৃষ্টি-ব্যাখ্যাকারের কথোপকথন ; চিন্তা ও চর্চার মধ্য দিয়ে যত দিন যাচ্ছে সঙ্গীতজ্ঞরা, গবেষকরা, বিজ্ঞানীরা ততই আবিষ্কার করে চলেছেন সঙ্গীতের ব্যাপ্তি - তার আবেদনের গভীরতা ও অবদানের প্রসারতা।

বাঙালির সঙ্গীতচর্চা

যে কোনও জনপদের মত বাংলাতেও ছিল আদিম কৌম ব্যবস্থা ; কৌমই চালনা করত সে সমাজকে। এর পর সমাজে দেখা যায় রাজা, রাজত্ব, রাষ্ট্র, শাসনযন্ত্র ইত্যাদির প্রভাব। গ্রীক সাহিত্য ও ভারতীয় শীলালিপি থেকে

[৮] John Shepherd and Kyle Devine [Eds.], *The Routledge Reader on The Sociology of Music,* Routledge, New York. 2015 দ্রষ্টব্য।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বাংলার এক রাজা ও রাজত্বের সন্ধান পেয়েছেন ঐতিহাসিকরা। উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাছে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ও রাজারা ছিলেন শূদ্র ; তখনও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কোনও চিহ্ন ছিল না এই অঞ্চলে। এর পর, বাংলায় যে-যুগ থেকে ঐতিহাসিকরা যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপাদান পেয়েছেন তা হল গুপ্ত যুগ। আনুমানিক ৩০০ থেকে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ জুড়ে বাংলার বাইরে থেকে আসা গুপ্ত রাজারা বাংলা শাসন করেন : বাংলায় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। এর আগে প্রথমে জৈন ও পরে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করেছিল বাংলায় - এবার এল বর্ণাশ্রম প্রথা ও বৈষম্যে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ্যবাদের পালা। বাংলার দেশজ কৌম সমাজের বিরোধিতা ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও বাংলাকে মুক্ত রাখা যায় নি বাইরে থেকে আসা এই সব ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে ; এই সময় থেকে বাংলায় কৌমতন্ত্রের স্থান অধিকার করে রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্র। হুনদের বারবার আক্রমণ ও নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের জেরে ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরু থেকে ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত আর সেই সুযোগে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় বেশিদিন স্থায়ী না হওয়া এক স্বাধীন রাজ্য। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রায় তিন দশক ধরে বাঙালি সমাজ পরিচালনা করেন বাঙালি রাজা শশাঙ্ক আর শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশো বছর ধরে বাংলায় চলতে থাকে সম্পূর্ণ অরাজকতার যুগ ; ঐতিহাসিকরা যাকে বলেন মাৎস্যন্যায়। এমন একটি পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাংলার সব সামন্ত রাজা, জমিদার ও বণিকরা পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে একজনকে রাজা বলে স্বীকার করে নেবার সিদ্ধান্ত নেন। বাঙালি সঙ্ঘশক্তির এই জাগরণে শুরু হয় বাঙালির ইতিহাসের নতুন পর্ব : অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালি রাজা গোপাল প্রবর্তিত পাল যুগ। প্রায় চার শতক জুড়ে পাল রাজাদের রাজত্বকালে সমাজে যে স্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয় তা বাঙালির সংস্কৃতিকে এক স্বতন্ত্র রূপ দেয়। পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তৎসত্ত্বেও শোনা যায় তাঁরা সব ধর্মের স্বাধীন বিকাশে বিশ্বাসী থাকায় বাংলায় এই যুগে সব ধর্ম ও সংস্কৃতিই বিকশিত হবার সুযোগ পায় ; বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এ এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দুই সংস্কৃতিই এক আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যে

আত্মপ্রকাশ করে হয়ে ওঠে বাঙালির সংস্কৃতি। এমন এক সময়ে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কর্ণাটক প্রদেশের রাজারা বাংলায় প্রতিষ্ঠা করেন সেন রাজত্ব। পরবর্তী প্রায় অর্ধশতক ধরে হিন্দু সেনবংশ বাংলায় আবার ফিরিয়ে আনে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির আধিপত্য।[৫]

পাল যুগের শেষ দিক থেকেই বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় নিতে থাকে এক অন্য চেহারা। সেন যুগে বৌদ্ধ বিদ্বেষের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম ধীরে ধীরে হয়ে পড়ে আরও কোণঠাসা। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বখত-ইয়ার খিলজীর বাংলা আক্রমণ ও পরবর্তীকালে বাংলায় মুসলিম শাসন, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মকে বাধ্য করে গোপন আচারের মধ্য দিয়ে তাদের ধর্মকে টিকিয়ে রাখতে : গোপ্য এই সাধনার প্রধান উৎস তন্ত্র, যোগ। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম, বজ্রযান-কালচক্রযান ও সহজযানে বিবর্তিত হতে থাকে। ধর্মাচরণ মিশে যায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিনতায় : লোকায়ত, তন্ত্র, যোগ, সাংখ্য, চার্বাক, কাপালিক ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় লোকদর্শনে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মও যুক্ত হয় এই সব সাধারণ মানুষের গণদর্শনের সঙ্গে, সেও বিবর্তিত হতে থাকে বৈষ্ণব সহজিয়া ও বহু গৌণ সহজিয়া সম্প্রদায়ে। উত্তর ভারত হয়ে সুফিবাদ ক্রমে যখন বাংলায় প্রবেশ করে, বাংলায় সে পেয়ে যায় তার বিকশিত হবার উর্বর জমি ; সহজিয়া ভরে ওঠে লোক জীবনাচরণের বিরাট বৈচিত্র্যে। শাস্ত্র-মন্ত্র-আচার বিরোধী এই গণদর্শনের মূল বিশ্বাসভূমি হল ইহলোক, প্রত্যক্ষ, দেহ : প্রেম।[৬] আর ঐতিহ্যর সঙ্গে দেহের সম্পর্ক খুব গভীর।

কোনও মঙ্গলগান গায়ক, খোলবাদক, কীর্তনীয়া অথবা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গায়ক-বাদক গান বাজনা করে চলেছেন আর তাঁদের সামনে খোলা রয়েছে কোনও খাতা বা বই - এ দৃশ্য এখনও অকল্পনীয়। ঐতিহ্যগত শিক্ষার সঙ্গে

---

[৫] রমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয়-চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, *বাংলা দেশের ইতিহাস,* জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিসার্শ লিমিটেড্, কলকাতা। ১৩৫৬ (১৯৪৯) ও নীহাররঞ্জন রায়, 'রাজবৃত্ত', 'ধর্মকর্ম : ধ্যানধারণা', *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। ১৪১০ [২০০৩] দ্রষ্টব্য।

[৬] Shashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature,* University of Calcutta. 1946 ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলায় ধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা', *বাংলার বাউল ও বাউল গান,* [১৯৫৭], ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা। ২০১৫, পৃ. ১৯০-২৯০ দ্রষ্টব্য।

সাক্ষরতার কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নেই। শ্রুতিবাহিত শিক্ষা তার সমগ্র জ্ঞানকে ধারণ করে শরীরে, স্মৃতি তার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। পরিবেশনার সময় শিল্পীদের শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়া এক অপূর্ব সামঞ্জস্যে গড়ে তোলে সঙ্গীত। শ্রুতিবাহিত সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষার্থী ধারণ করে তার শরীরে ; রক্তপ্রবাহ, শ্বাস-প্রশ্বাস, শারীরিক আন্দোলন হয়ে ওঠে সঙ্গীতের নিরাপদ আশ্রয়।

যে কোনও জনগোষ্ঠীর মতন বাঙালির সঙ্গীতচর্চাও নিশ্চয়ই চলে আসছে প্রাচীন কাল থেকে। কী ছিল সেই সময়কার সঙ্গীতের গঠন, চলন বা শাস্ত্র, তা এখন শুধু অনুমানই করা যায় এই অঞ্চলের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর সঙ্গীতচর্চার মধ্যে। দশম-একাদশ খ্রিষ্টাব্দের আগে বাংলায় সঙ্গীতচর্চার এমন কোনও উপাদান ঐতিহাসিকরা খুঁজে পাননি যা সেই যুগের গীত-বাদ্য-নৃত্য চর্চা সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে।

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বৌদ্ধ *চর্যাগীতি*-তে রাগ ও তালের উল্লেখ বাঙালির সঙ্গীতচিন্তার একটি আদলের আভাস দেয়। বল্লাল সেনের সমসাময়িক লোচন পণ্ডিত *রাগতরঙ্গিনী* রচনা করেন ১১৬০ সালে। *গীতগোবিন্দ* রচয়িতা কবি জয়দেব ছিলেন বীরভূম জেলার কেন্দ্রবিল্ব গ্রামের সন্তান ও লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার সভাকবি। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল আনুমানিক ১১৭৯ থেকে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ। অবহট্ট ও বাংলা ভাষায় রচিত *চর্যাগীতি* এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা *গীতগোবিন্দ*-র এই পদগুলি গান হিসেবেই রচিত হয়েছিল ; *গীতগোবিন্দ* নৃত্যসহযোগেও গাওয়া হত। গানের সঙ্গে উল্লিখিত রাগ ও তালের নাম দেখে অনুমান করা যায় যে বাংলায় তখন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দুটি ধারাই সক্রিয় ছিল। সেন বংশ কর্ণাটক থেকে এসে বাংলা অধিকার করে ; কর্ণাটিক সঙ্গীতশাস্ত্রর সঙ্গে এই সূত্রে বাঙালির পরিচয় হওয়া তাই স্বাভাবিক। কিন্তু কেবল মাত্র রাগ ও তালের উল্লেখ থাকলেই গানের সাঙ্গীতিক রূপটি পাওয়া যে সম্ভব নয়, এ-কথা সব সঙ্গীতজ্ঞরাই স্বীকার করবেন। *চর্যাগীতি* ও *গীতগোবিন্দ*-য় রাগ ও তালগুলির উল্লেখ থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে বাংলার সঙ্গীতচর্চার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, রচনার স্পষ্ট সাঙ্গীতিক রূপ

অথবা চলন বোঝা যায় না। অন্যদিকে বহু-আলোচিত ও প্রচারিত শার্ঙ্গদেবের *সঙ্গীতরত্নাকর* রচনার আগে রচিত লোচন পণ্ডিতের *রাগতরঙ্গিনী*-তে সঙ্গীততত্ত্ব ও আঙ্গিকের বিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় বাংলায় সঙ্গীত নির্মাণ-পদ্ধতির তৎকালীন চর্চার। *চর্যাগীতি* ও *গীতগোবন্দ*-ও শার্ঙ্গদেবের *সঙ্গীতরত্নাকর*-এর আগে রচিত ; এদের পদে উল্লিখিত রাগ-তালের সঙ্গে *রাগতরঙ্গিনী*-র তত্ত্বগত অবস্থানের মিল থাকাই স্বাভাবিক।[৭] তিনশো বছরের মধ্যে লিখিত, গেয়, চর্চিত *চর্যাগীতি*, *রাগতরঙ্গিনী* ও *গীতগোবিন্দ* এবং তারপর রচিত *মঙ্গলগীত* বাঙালির সঙ্গীতবোধকে এক নির্দিষ্ট কাঠামোয় প্রতিষ্ঠা করেছিল, এমন মনে করা অসঙ্গত নয় নিশ্চয়ই।

ত্রয়োদশ শতকে শার্ঙ্গদেবের *সঙ্গীতরত্নাকর* রচনা ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দেখা যাচ্ছে এই সঙ্গীতশাস্ত্র রচনার আগেই বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাঙালির নিজস্ব এক সাঙ্গীতিক পরিবেশ। লক্ষ করা যায় যে বাঙালির সঙ্গীত গড়ে উঠেছে কাব্য ও আখ্যানকে কেন্দ্র করে ; একটি আখ্যান সুর-তাল-ছন্দের মধ্যে দিয়ে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই সঙ্গীতের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে লক্ষণীয় এই যে বাঙালির সঙ্গীতের সঙ্গে রাগসঙ্গীতের সম্পর্ক বহু প্রাচীন। বাঙালির সঙ্গীত তাই রাগ-তাল-কাব্য-নৃত্যাভিনয় এবং আখ্যানের মিলিত রূপ হয়েই বয়ে চলেছে দীর্ঘ দিন ধরে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা কীর্তন যখন একটি নির্দিষ্ট চেহারায় নিজেকে আত্মপ্রকাশ করে তখন এই মিলিত সাঙ্গীতিক রূপটি সাঙ্গীতিক বিকাশের এক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে খুলে দেয় বাঙালির নিজস্ব সঙ্গীতের ভুবন।

---

[৭] ক্ষিতিমোহন সেন, 'জয়দেব : গীতগোবিন্দ', 'রাগতরঙ্গিনী', *বেদোত্তর সঙ্গীত*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। ১৯৮৪ ও নীহাররঞ্জন রায়, 'সংগীত ও নৃত্য', *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩, কলকাতা। পৃ. ৬৩৭-৬৪৩ দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীত ও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সমাজ

জনপরিসরে সঙ্গীতের স্থান আজ অনেকটাই বদলেছে। নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত নতুন সমাজ সংগঠন, বাজার-নগর-অধীনতা বদলে দিয়েছে সমাজে সঙ্গীতের স্থান, মানুষ-সঙ্গীত সম্পর্ক। সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় যান্ত্রিক উৎপাদনে মানুষ যখন একই সাংস্কৃতিক রূপের অফুরন্ত অবিকল নকল রূপ তৈরি করতে সক্ষম হল, মানুষ-সমাজ সম্পর্কে তখন এল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ছাপাখানা নিয়ে এল একই বইয়ের অসংখ্য মুদ্রণ[৮] ; যান্ত্রিক উৎপাদনে হস্তশিল্পের মূলরূপের অফুরন্ত অবিকল নকলে ভরে যেতে লাগল বাজার[৯] ; কোন যন্ত্রে কোনও বিখ্যাত ছবির প্রতিলিপি মূল ছবির কত কাছাকাছি পৌঁছল, শুরু হল সেই নিয়ে প্রতিযোগিতা[১০] ; সঙ্গীতের যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন হয়ে উঠল উত্তরোত্তর পরিশীলিত, গান-বাজনা শোনার যন্ত্র সহজলভ্য, হাল্কা ও ছোটো। একইসঙ্গে পৃথিবীর যে কোনও জনগোষ্ঠীর একই সঙ্গীত শোনা, একই হস্তশিল্প কানে-হাতে-কোমরে পরা, একই খবরের কাগজ ও বই পড়া সম্ভব হল এই যান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার যাদুতে। ইয়োরোপিয় দার্শনিকরা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখালেন যে ইয়োরোপে এই যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগ থেকে শিল্পীর কাজ বিশিষ্ট এক মৌলিক শিল্পরূপের সৃষ্টি আর রইল না। তাঁদের কাজ হয়ে দাঁড়ালো অসংখ্য অবিকল নকল তৈরি করতে সক্ষম, এমন ব্লকের উৎপাদন : কাঠের ব্লক, দস্তার প্লেট, ফিল্মের নেগেটিভ ইত্যাদি। সঙ্গীতের পুনরুৎপাদন রেকর্ডিং - সিলিন্ডার ফোনোগ্রাফ, ভাইনিল রেকর্ড, ম্যাগনেটিক টেপ, ডিজিটাল টেপ, কম্প্যাক্ট ডিস্ক, ডিজিটাল হার্ড ডিস্ক ইত্যাদি - যেমন একদিকে খুলে দিল সঙ্গীতবাজারের বিরাট সম্ভাবনা, অন্যদিকে সঙ্গীত-মানুষ

---

[৮] Lucien Lebvre and Henri-Jean Martin, *The Coming of the Book* : *The Impact of Printing 1450-1800*, Verso, London, New York. 1976 দ্রষ্টব্য।

[৯] Elizabeth Cumming, Wendy Kaplan, *The Atrs and Crafts Movement*, Thames & Hudson. 2004 দ্রষ্টব্য।

[১০] John Berger, *Ways of Seeing*, BBC and Penguin, London. 1972 দ্রষ্টব্য।

সম্পর্কে নিয়ে এল এক গুণগত পরিবর্তন। লীলাকীর্তন শুনতে এখন আর কীর্তনের আসরে যাবার প্রয়োজন হয় না, সে-গান বাড়িতে-গাড়িতে-বাগানে বসে শোনা যায়। নির্দিষ্ট ঋতুতে বিশেষ কোনও অঞ্চলের ঋতু উৎসবে অংশ নেবার প্রক্রিয়ায় গান গাওয়া-শোনার আগ্রহ ও প্রয়োজন ফুরিয়ে আসে ; ঝকঝকে শরতের সকালে পুজো প্যান্ডেলের চোঙা মাইক থেকে উচ্চৈঃস্বরে বাজতে থাকে বর্ষার গান। অন্যদিকে কণ্ঠস্বর ও বাদ্যযন্ত্রের নিকাশকে হতে হয় মাইক্রোফোন-স্টুডিও-অডিটোরিয়াম উপযোগী, সঙ্গীতকে হতে হয় চোঙামাইক-হেডফোনস্-স্মার্টফোন-নির্ভর : পুজোর গান, সিনেমার গান, আধুনিক গান, রেডিওতে মহালয়ার গান ইত্যাদি আচ্ছন্ন করে মানুষের শ্রবণ ও সঙ্গীতালোচনার জগতকে। অনেকের মতে এই যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের ফলে সংস্কৃতি তার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ভিত থেকে সরে গিয়ে মুক্তি পায় রাজনৈতিক ভূমিতে ; বিশেষ স্থান-কালে ঘটে চলা অদ্বিতীয়-অস্থায়ী কোনও শিল্পসৃষ্টি হারায় তার কর্তৃত্বের আভা, মৌলিকত্বের জ্যোতি।[১১] এই বিশ্লেষণের ভিত্তি ইয়োরোপিয় সমাজ, আমাদের সমাজে তাই এই ব্যাখ্যা সবসময় খাপে খাপে নাও মিলতে পারে। ওদেশেও এর ব্যাতিক্রমের অভাব নেই ; এখনও প্রতি রবিবার গীর্জায় সাধারণ মানুষ, খ্রিষ্টান মনাস্টেরিতে তীর্থযাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতি ও সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় আচার পালন অথবা পাঁচশো বছর আগে আঁকা 'মোনালিসা'র দর্শনার্থীদের ভিড়ই তার প্রমাণ। 'জ্যোতি'র আঁচ পাওয়ার লোভ মানুষ এখনও ভোলেনি ; কর্তৃত্বে আসক্তি আর সেইখান থেকে উদ্ভূত উন্মাদনা থেকে মানুষ এখনও মুক্ত হতে শেখে

---

[১১] 'for the first time in world history, mechanical reproduction emancipates the work of art from its parasitical dependence on ritual. To an ever greater degree the work of art reproduced becomes the work of art designed for reproducibility. From a photographic negative, for example, one can make any number of prints; to ask for the "authentic" print makes no sense. But the instant the criterion of authenticity ceases to be applicable to artistic production, the total function of art is reversed. Instead of being based on ritual, it begins to be based on another practice - potitics.' Walter Benjamin, 'The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction' (1936), *Illuminations*, Fontana. 1982. p. 226

নি। উপরোক্ত বিশ্লেষণকে তাই প্রধানত একটি ঝোঁক হিসেবে দেখলেই যথার্থ দেখা হবে।

এ-কথা সত্যি যে সঙ্গীত আজ হয়ে উঠেছে প্রধানত ব্যাকগ্রাউণ্ড কোলাহল, কেনার-জমানোর-বেচার দ্রব্য ; শোনার শিল্প নয়। শোনা যায়, আমোদের বাজারে সঙ্গীতের বিক্রি অন্য যে কোনও আমোদিয়া পণ্য থেকে বেশি।[১২] নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে, নাগরিক মনের ব্যাকগ্রাউণ্ড কোলাহলের চাহিদা মেটানোর বাধ্যবাধকতায়, সঙ্গীত হয়েছে অতিসরলীকৃত। টেক্নলজি নির্ভর যন্ত্রোৎপাদিত পৌনঃপুনিক এই সরল 'বুম-চ্যাক' ধ্বনিবিন্যাস সঙ্গীতকে একদিকে করে তুলেছে একঘেঁয়ে, অন্যদিকে কোলাহলকে সঙ্গীত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সঙ্গীতকে করেছে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন।

আমার গোবিন্দের মত,
আদর দিতে আদর নিতে কে বা জানে রে,

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চলতে থাকে একাধিক চক্রের খেলা - ঋতু-চক্র, কার্বন-চক্র অথবা আদর-চক্র। প্রতিটি চক্র একের সঙ্গে অপরের সঙ্গতি রেখে রক্ষা করে বিশ্বপ্রকৃতির ভারসাম্য। এই চক্রের গতিতে লুকিয়ে থাকে দেওয়া-নেওয়ার লীলা। মানুষের একতরফা প্রকৃতি লুণ্ঠন, দরিদ্র দেশের ওপর ধনী দেশের একবল্গা নির্যাতন ও আধিপত্য বিস্তার, উচ্চবর্গের একমুখী শ্রমজীবি শোষণ বিঘ্নিত করে চক্রের সামঞ্জস্যে তৈরি ভারসাম্যকে। অস্থির সেই সময় মানুষে-প্রকৃতিতে, মানুষে-মানুষে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে তীব্রতর হয়ে ওঠে দ্বন্দ্ব যার অবশ্যম্ভাবী

---

[১২] 'Music is now an enigmatic comforter, a source of profit, a stake in power struggle: it is background noise admired by many who do not really listen, and is bought, never to be really heard. Today, more money is spent on music than on books, films, or any other source of entertainment, and music is at the forefront of globalization.' Jacques Attali, 'Foreword', Regula Burckhardt Quereshi [Ed.], *Music and Marx: Ideas, Practice, Politics,* Routledge, New York & London. 2002

পরিণতি ধ্বংস ও যুদ্ধ। আগ্রাসনের তিক্ষ্ণতার প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে প্রতিরোধ আর প্রেমের দর্শন : *আদর দিতে আদর নিতে কে বা জানে রে* ... প্রেম জাগায় আশা ; প্রেমই হয়ে ওঠে স্থিরতা ফেরাবার, মনুষ্যত্ব পুনরুদ্ধারের একমাত্র সূত্র। *(আমার গোবিন্দের মত), আদর দিতে আদর নিতে কে বা জানে রে* ... দেওয়া আর নেওয়া, নেওয়া-দেওয়া ক্রিয়াশীল থাকে দায়, মমত্ব বা ঋণের বোধের বাইরে ; কখনো কখনো দেওয়াই হয়ে যায় পাওয়া। কীর্তনের দানলীলার এই আখর[১৩] রাধা-গোবিন্দ মিলনের তাৎক্ষণিক প্রেক্ষিত অতিক্রম করে স্পর্শ করে সমগ্র সমাজের জনপরিসরকে :

আদর দিতে আদর নিতে কে বা জানে রে ...

সঙ্গীত যখন ভাঙতে ভাঙতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পরিণত হয় কোলাহলে, সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারে তখন মানুষ হয়ত আবার ফিরে যেতে চায় গণদর্শনের মজবুত ভিতে। একদিকে বৈষম্যমূলক ধর্মীয় মৌলবাদ আর অন্যদিকে সর্বজনীন যুক্তিবাদ-সর্বস্ব, নগরকেন্দ্রিক আধুনিকতার মৌলবাদকে ভেঙে ভেঙে তখন হয়ত গড়ে উঠতে পারে প্রেমময় কোনও ভাঙনের সঙ্গীত চর্চা।

---

[১৩] মুর্শিদাবাদ জেলার নন্দকিশোর দাশের কণ্ঠে এই দানলীলা শোনা যাবে নিচের লিঙ্ক-এ, এই আখরটি শোনা যাবে ১৮:১০ মিনিট থেকে। সঙ্গের খোল বাদক মুর্শিদাবাদ জেলারই সুবোধ সাহা। http://www.thetravellingarchive.org/related_research.php 'Letters from Mainadal'

নির্দেশিকা


নিউ মর্ডাণ লণ্ডী
এখানে কাপড় ইস্ত্রী ও ওয়াস,
পালিস করা হয়।
প্রোঃ- বিট্টু M-9800700195.
জামবুনি
বোলপুর